ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাএ ৯৮৭
পাণ্ডুলিপি ঃ অনুবাদ বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
এস. খান
শাহজাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯৭/২, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা—২

প্রচ্ছদ ঃ কাইয়ুম চৌধুরী

ভূমিকা

বর্তমান গ্রন্থের লেখাগুলো এপ্রিল থেকে অগস্ট মাসের মধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। এই সূত্রে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ও শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

পূর্ব-বাংলার চিত্ত-জাগরণের ইতিহাস পশ্চিমবঙ্গের কাছে সংক্ষেপে উদ্‌ঘাটিত করার ইচ্ছে নিয়ে এ লেখাগুলি রচিত হয়েছে; কিন্তু রচনাকালে গ্রন্থের পরিকল্পনা ছিলো না। ফলে পুনরাবৃত্তির দোষ অনেক স্থানেই ঘটেছে। এমন কি, একই যুক্তি ও তথ্যের পুনরাবৃত্তিও চোখে পড়বে। গ্রন্থ প্রকাশকালে দু-চার জায়গায় কিছু পরিবর্তন করেছি, কিন্তু তাতে করে দোষের স্খালন হয়নি।

উদ্‌বাস্তু হয়ে কলকাতায় এসে এ লেখাগুলি তৈরি করেছি। যে মানসিক প্রশান্তি ও পরিবেশের আনুকূল্য উৎকৃষ্ট রচনার জন্যে অত্যাবশ্যক, বলা বাহুল্য, তা আমার ছিলো না। তদুপরি তথ্যমূলক রচনার জন্যে যে গ্রন্থাদির প্রয়োজন, সে-ও আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। সুতরাং রচনার গুণাগুণ বিচারে পাঠককে সদয় হতে হবে।

আমার অনচ্ছ ও নীহারিকাবৎ চিন্তাকে স্বচ্ছ ও সাকার হতে সহায়তা করেছেন সনৎকুমার সাহা। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক এমন যে, ধন্যবাদ জানানো বাহুল্য।

পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে রীতিমতো পরিশ্রম করেছেন জনাব গাজীউল হক। তা ছাড়া, ভাষা আন্দোলন ও কাগমারি সম্মেলন সম্পর্কে কিছু তথ্য তিনি আমাকে জানিয়েছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী জনাব কামরুল হাসান এ গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

হাসান মুরশিদ

পাকিস্তানের মৌল আদর্শ ... ১
ভাষা আন্দোলন ... ১৭
সাম্প্রদায়িকতা ও রবীন্দ্রবিরোধিতা ... ৩৬
অর্থনৈতিক পটভূমি ... ৪৪
রাজনৈতিক পটভূমি ... ৬৭

সংযোজন

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ... ৮৭
সাম্প্রদায়িকতা ... ৯২
সাম্প্রদায়িকতা ও বাংলাদেশ ... ১০০
পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ... ১০৫
বাংলাদেশের পত্রপত্রিকা ... ১০৮
বাংলা অ্যাকাডেমি ... ১২৩
পূর্ব বাংলার শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ ... ১৩২
কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ... ১৩৬
ছায়ানট ... ১৪১
'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' এবং 'মহাকবি স্মরণোৎসব' ... ১৪৫

পাকিস্তানের মৌল আদর্শ

যদিচ জগতের রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে, জাতীয়তার ভিত্তি প্রধানত ভাষা ও প্রাকৃতিক তথা ভৌগোলিক অখণ্ডতা ; এবং ধর্মের ভিত্তিতে সারা য়োরোপে অথবা আফগানিস্থান থেকে মরোক্কো পর্যন্ত একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়নি, তথাপি দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তারা দাবি করেছিলেন যে, জাতীয়তার প্রধান শর্ত ধর্ম এবং ধর্মের ভিন্নতা জাতীয়তার পার্থক্য ঘটাতে বাধ্য। এই দাবির ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিলো এবং জন্ম হয়েছিলো পাকিস্তান নামক একটি কিম্ভুত রাষ্ট্রের। কিম্ভূত, কেননা, দেড় হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত দেশের দুটি অংশ এবং এই দুই অংশের জনগণের ভাষা আলাদা, আলাদা পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি-রুজি, খাদ্যপানীয়—সংক্ষেপে সংস্কৃতি। ধর্মের ঐক্য ব্যতীত পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের কার্যত কোনো মিল নেই। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বকালে ঐতিহাসিক কারণে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান-সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে ওঠে এবং তীব্র সাম্প্রদায়িকতার মুখে ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। দেশবিভাগের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে মুসলমানরাও একটা উগ্র ধর্মোন্মত্ততায় আচ্ছন্ন হন। এবং এই নেশা সাময়িককালের জন্যে একটি ধর্মীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত জাতীয়তাবোধেরও বোধহয় জন্ম দিয়েছিলো। ফলস্বরূপ স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম একটি ইসলামি রাষ্ট্রগঠন নেতা ও সাধারণ মুসলমানদের সর্বাত্মক সংগ্রামের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু রাজনৈতিক প্লাটফর্মে ধর্মের ধরতাই বুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে

পারলেও অথবা তা-ই দিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করা সম্ভব হলেও, তা মানুষের স্থায়ী মূল্যবোধ নির্মাণ করতে পারে না।

এ কারণেই দেখি পাকিস্তান সৃষ্টির পরে সে দেশের মানুষের মধ্যে কোনো নবমূল্যবোধ গড়ে ওঠেনি। শিক্ষাসম্প্রসারণ এবং বর্ধিত ও অবাধ অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধার ফল-স্বরূপ অল্পদিনের মধ্যেই সে দেশে, এ যাবৎ অস্তিত্বহীন, একটি নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী জন্মলাভ করে। প্রত্যক্ষ ফলাফল হিশেবে অবশ্য ভূমিহীন কৃষক ও বিত্তহীন পেশাদারদের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কোনো মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত মূল্যবোধ অর্জনের চেয়ে আপনাপন স্বার্থ ও সৌভাগ্য অর্জনের প্রযত্নই হলো এ সমাজের প্রধান লক্ষ্য। মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনাস্বাদিতপূর্ব প্রাচুর্যের সন্ধান পেয়ে হিন্দুদের প্রতি সহজেই ঈর্ষামুক্ত হলেন। আর দেশের অগণ্য সাধারণ মানুষ ইসলামি ধুয়োর অর্থহীনতাও স্বল্পকালে উপলব্ধি করতে পারলেন। অর্থনৈতিক লাভ অথবা হতাশা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা অথবা অমর্যাদা দুই দশকের মধ্যেই পূর্ব বাংলার মানুষকে ধর্মীয় অন্ধতা থেকে মুক্তি দান করে।

অথচ ধর্ম হচ্ছে পাকিস্তানের জন্মের মূল ভিত্তি এবং দুটি স্বতন্ত্র ভাষাভাষী জাতির একমাত্র ঐক্যসূত্র। সেই ধর্মকে দৃঢ়মূল না করতে পারলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য। মিথ্যার ওপর রচিত সৌধকে বহু মিথ্যার পিলাব গেঁথে টিঁকিয়ে রাখতে হয়। অত্যন্ত ধূর্ত এবং ধুরন্ধর মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ও তাঁর চেলাদের ধর্মের চোরাবালির ওপর নির্মিত পাকিস্তানের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভালোভাবে জানা ছিলো। তাঁরা জানতেন দৃঢ়তর কোনো বন্ধনের অভাবে ধর্মের আপাত সঙ্গতি দিয়ে পূব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের কেবল একটা তাৎক্ষণিক মিলন ঘটানো সম্ভব। কিন্তু পূর্ব বাংলার সঙ্গে গভীরতর যোগ পশ্চিম বাংলার। সে যোগ বহু শতাব্দীর ; সে যোগ ভাষার, সাহিত্যের, পোশাক-

পরিচ্ছদের, শিক্ষাদীক্ষার, রুচি-রুজির— এক কথায় মনের ও সংস্কৃতির। অমিল কেবল ধর্মীয় আচারের। মতানৈক্য ও পরিণামে একটা সংঘর্ষ ঘটাতে সে অমিলটুকু সময়বিশেষে হয়তো যথেষ্ট হতে পারে; কিন্তু আধুনিক যুগে জীবন-যুদ্ধে মানুষ যখন একান্ত বিপর্যস্ত, ধর্মের প্রকোপ তখন প্রতিদিন ক্ষীয়মাণ। বর্তমান সমাজে বরং অর্থনৈতিক সাম্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে সুনিশ্চিত করে। অতএব পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সাংস্কৃতিক ঐক্য পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতি বিরাট প্রতিবন্ধক এবং অব্যাহত ঝুঁকি। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার এ হেন যোগসূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তাদের মূলধন ও প্রচারের বিষয় হলো পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের ধর্মীয় ঐক্য এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার ধর্মীয় অসঙ্গতি। পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই এই নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখতে পাই সরকারি কার্যকলাপে এবং শিক্ষা-সংস্কৃতিক্ষেত্রে।

কিন্তু ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি তেমন শক্ত না হলেও, সমাজ-অর্থনৈতিক জীবনে, লক্ষণীয় বাস্তব প্রভেদ না থাকলে, সংস্কৃতির ভিন্নরূপ কল্পনা করা দুঃসাধ্য। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায়, অনুসৃত অর্থনৈতিক কর্মপ্রবাহে, শিক্ষা-দীক্ষায়, সঙ্গীত ও সাহিত্যে, রুচি ও পসন্দে পূর্ব বঙ্গের মধ্যবিত্তের সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের মধ্যবিত্তের, দরিদ্রের সঙ্গে দরিদ্রের, ব্যবসায়ীর সঙ্গে ব্যবসায়ীর, শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষকের, গায়কের সঙ্গে গায়কের, মোল্লার সঙ্গে পুরুতের কি মৌল কোনো প্রভেদ আছে, না কোনো কালে ছিলো! বরং মধ্যবিত্তের সঙ্গে বিত্তহীনের, ব্যবসায়ীর সঙ্গে শিক্ষকের, সঙ্গীত-শিল্পীর সঙ্গে মোল্লা অথবা পুরুতের, কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার কিংবা ব্যারিস্টারের সাংস্কৃতিক ভিন্নতা চিরকালই ছিলো, আজো আছে। কিন্তু সংস্কৃতির এই বাস্তব পার্থক্য স্বীকার না করে, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে কেবলমাত্র ধর্মীয়

কারণে সাংস্কৃতিক অনৈক্য আবিষ্কার করা প্রচারের বিষয় হতে পারে এবং প্রচারকরা হয়তো এ অর্ধ-সত্যে বিশ্বাস করেন যে, বহুপ্রচারের ফলে অনৃত ভাষণও সত্যের মর্যাদা লাভ করে; কিন্তু তাই বলে এই সাংস্কৃতিক অনৈক্য এবং পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক ঐক্য কল্পনা কখনো সত্য হতে পারে না। তবু স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরবর্তী নবমূল্যবোধহীন সময়ে পাকিস্তানস্রষ্টারা পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে ইসলামভিত্তিক একটি অভিন্ন সংস্কৃতির জন্ম দিতে চাইলেন। তার জন্যে, প্রথমত, প্রাক্‌স্বাধীনতাকালের সমগ্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার প্রয়োজন হলো। দ্বিতীয়ত, আবশ্যক হলো নতুন ছাঁচে ফেলে একটি সাধারণ সংস্কৃতি গড়ে তোলা। (সংস্কৃতি কি গড়ে তোলা যায়? ভাষার মতো সে-ও কোনো জুলুম সহ্য করে না, আপন স্বভাবে সে বিকশিত হয়, যেমন ফুল ফোটে তার আপন বৃন্তে।)

একথা অনস্বীকার্য যে সংস্কৃতির প্রধান উপাদান ভাষা ও সাহিত্য। এ বিষয়ে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের অমিল যতখানি, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মিল ততখানি। তদুপরি, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ভৌগোলিক ব্যবধান প্রাকৃতিক নয়, একান্তই কৃত্রিম। এমতাবস্থায় পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে একাত্মতা স্থায়ীভাবে উচ্ছেদ করার জন্যে পাকিস্তান-নির্মাতাগণ প্রথমেই ভাষার যোগ-সূত্রকে ছিন্ন করতে চাইলেন। এর জন্যে তাঁরা তিনটি উপায় অবলম্বনের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। প্রথমত, দুই-তৃতীয়াংশ পাকিস্তানিদের মাতৃভাষাকে কোনোপ্রকার গুরুত্ব দান না করা; দ্বিতীয়ত, আরবি (আসলে উর্দু, ধর্মের দোহাই দেবার উদ্দেশ্যে আরবি) অথবা রোমান হরফে বাংলা লেখার রীতি প্রচলন করা; এবং তৃতীয়ত, প্রচুর পরিমাণ আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করে বাংলাকে উর্দুর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দিলে, শাসকবর্গ যথার্থই অনুমান করেছিলেন, বাংলা শিক্ষার প্রতি পূর্ব বাংলার জনগণের আগ্রহ ও উৎসাহ কমে যাবে, এবং উর্দু শিখে সরকারি চাকুরি লাভের চেষ্টাতেই অতঃপর তাঁরা প্রযত্নবান হবেন। এই শাসকচক্র আরো ভেবেছিলেন বাংলা ভাষার পঠন-পাঠনের প্রতি বিমুখতা পরিণামে বাংলা ভাষার চর্চা পুরোপুরি বিলুপ্ত করবে। এবং বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে পাকিস্তানের বুনিয়াদ হবে পাকা এবং সম্ভাব্য কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের আশঙ্কা দূরীভূত হবে চিরকালের জন্যে। তা ছাড়া শাসকচক্র ভেবেছিলেন, রাষ্ট্রভাষা হিশেবে উর্দুকে চাপিয়ে দিতে পারলে বাঙালি ছাত্ররা চিরকাল অতিরিক্ত একটি ভাষার বোঝা বহন করতে বাধ্য হবে। তেমন অবস্থায়, বাঙালিরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পিছিয়ে থাকবে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় এবং ফলস্বরূপ নীতিনির্ধারক আমলাতন্ত্রের মধ্যে কখনোই প্রবেশ করতে অথবা আধিপত্য খাটাতে পারবে না।

আরবি অথবা রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রচেষ্টাও পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ১৯৪৭ সালেই অধুনালুপ্ত পাকিস্তানের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান প্রস্তাব করেন বাংলা ভাষার হরফের জটিলতা হেতু আরবি অথবা রোমান বর্ণমালা তার পরিবর্তে গৃহীত হোক। তিনি ভেবেছিলেন আরবি হরফে বাংলা লেখা হলে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের দ্বারা বাংলা ও উর্দুর ভেদ ঘুচিয়ে দেবেন তাঁর দালালরা। অপর পক্ষে, রোমান হরফে লেখা হলে উর্দু ভাষাও রোমান হরফে লিখে বাংলা ও উর্দুর একই রূপ দান করা হবে। ভবিষ্যৎ এই লাভ ছাড়াও, উজিরের মনে এ পরিকল্পনা ছিলো যে, আরবি অথবা রোমান হরফে লিখতে শুরু করলে প্রাক্-স্বাধীনতা কালের বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশই যেহেতু নতুন

হরফে মুদ্রিত হবে না এবং উচ্চারণও বিকৃত হবে, সেহেতু পূর্ব বাংলার লোকেরা একদিকে যেমন হিন্দু প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেয়ে উত্তীর্ণ হবেন ইসলামের পাকগগনে তেমনি অন্যদিকে গৌরবোজ্জ্বল বাংলা সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে দরিদ্র ও নির্জীব হবেন! পরিশেষে আধা-হিন্দু বাঙালি মুসলমানরা হয়তো ইসলামি পথে ভাবতে শিখবেন।

প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চিমী শাসকগণ বাংলা ভাষাকে আখ্যায়িত করলেন 'হিন্দু' ভাষা বলে। যেন ভাষারও সত্যি সত্যি কোনো ধর্ম আছে অথবা হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থাদি সব বাংলায় লেখা অথবা বাংলা ভাষাভাষীদের অধিকাংশ হিন্দু। (এমন কি তা যদি সত্য হতো, তা হলেও ইসলাম ধর্মের সঙ্গে এ ভাষার কোনো বিরোধ কল্পনা করা সম্ভব নয়; কেননা সুস্থ চিন্তার অধিকারী কেউ মাতৃভাষার সঙ্গে ধর্মপালনের কোনো প্রতিবন্ধকতা খুঁজে পাবেন না। পেলে সেই ধর্ম ধর্মই নয়।) এ জন্যে তাঁরা প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ আমদানি করে কাফেরদের ভাষা বাংলাকে ইসলামি চেহারা দিতে উপদেশ দিলেন। তাঁদের সাংস্কৃতিক দালালরা একটি ভাষা সংস্কার কমিটি গঠন করে রায় দিলেন, হিন্দু বাংলাকে মুসলমানি বাংলায় রূপান্তরিত করতে হবে। তাঁরা বললেন, 'তোমাকে আমি জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না—এর বদলে লিখতে হবে 'তোমাকে আমি কেয়ামততক ভুলিব না।' 'মাসের পরিসমাপ্তিতে ঋণ শোধ করিব'—এর বদলে লিখতে হবে 'মাস কাবারিতে কর্জ আদায় করিব।' বলা বাহুল্য শব্দ ব্যবহারের বেলায় সবুজীকরণের প্রস্তাব ধর্মের কারণে নয়, বরং পাকিস্তানের উভয়াংশের দুর্বল যোগসূত্রকে শক্ত করাই ছিলো এর উদ্দেশ্য। এ জাতীয় আরবি-ফারসি শব্দের প্রাচুর্যের ফলে এবং উর্দুতে তদ্‌ভব শব্দের আমদানির ফলে পূর্বপশ্চিম একাকার হয়ে যাবে,

এ ছিলো এ মহান পরিকল্পনার একমাত্র লক্ষ্য।

এরপর একে একে রবীন্দ্রবিরোধী প্রচার, ভারতীয় বইপত্রের আমদানি নিষিদ্ধকরণ, টেকস্ট-বুক কমিটি গঠন, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্র ইসলামি পাঠক্রম নির্ধারণ, বেতার ও প্রেসে ভারতবিরোধী প্রচার ইত্যাদি সবই পূর্ব ও পশ্চিমের সংকর বিবাহের দুর্বলতাকে চাপা দিয়ে তাকে মজবুত করার প্রয়াসজাত। শুদ্ধমাত্র ধর্মের ঐক্য প্রদর্শন করে অভিন্ন সংস্কৃতির জন্মদানের উদ্দেশ্যেই এই উদ্যম ও কঠোর শ্রম। আগেই বলেছি, স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে নতুন কোনো মূল্যবোধ গড়ে ওঠেনি, তাই পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও সঠিক ধারণা ছিলো না তাঁদের বক্তব্য কী। যাঁরা পাকিস্তানের জন্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করেছেন—কলম নিয়ে অথবা ছোরা নিয়ে, হঠাৎ-পাওয়া স্বাধীনতার আনন্দে সব কিছু হিন্দুত্ব তথা বাঙালিত্বের ওপর তাঁরা মারমুখী হয়ে উঠলেন। আর একদল, যাঁরা পাকিস্তান অর্জনের ফলে সমাজজীবনে প্রকৃত অর্থে কোনো পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করতে অপারগ হলেন, তাঁরা তথাকথিত ইসলামি সমাজব্যবস্থার কোনোরূপ গূঢ় তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারলেন না। অতএব আবহমান বাংলার ধারাকেই তাঁরা আঁকড়ে থাকলেন। কিন্তু মধ্যপন্থী অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই ভাবলেন, ইসলামের নামেই যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র নির্মিত হয়েছে, সেই ইসলামকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁদের কাজ। প্রাত্যহিক জীবনে তাঁরা যে ইসলামি রীতিনীতির অনুগত সেবক তা নয়, তথাপি ধর্মীয় রাজনৈতিক শ্লোগান তাঁদের তাৎক্ষণিকভাবে উদ্‌বোধিত করেছিলো। সামগ্রিকভাবে বুদ্ধিজীবীদের এই অব্যবস্থচিত্ততা সম্বন্ধে পূর্ব বাংলার, বোধহয় সবচেয়ে সাহসী, সংস্কৃতিসেবী বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, 'পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ে মুসলমানদের "তাহজীব" "তমদ্দুন" ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত ধারণার অবর্তমানে কেউ এ

সবের দ্বারা মনে করলো কোরমা, পোলাউ, কোফতা ও গরু খাওয়ার স্বাধীনতা। কেউ বা আবার মনে করলো ভাষার মধ্যে যথেচ্ছভাবে আরবি-ফারসি শব্দ আমদানির স্বাধীনতা। কেউ ভাবলো মরুভূমির উপর কবিতা লেখার স্বাধীনতা। কারো কাছে বা মুসলমানদের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ মানে বোঝালো মসজিদের সামনে হিন্দুদের বাদ্যবাদনের পরিবর্তে মুসলমানদের সেই কাজের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। কারো কাছে এর অর্থ হলো বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করে তাব স্থলে আলাওল, গরীবুল্লাহ এবং কায়কোবাদকে অভিষিক্ত করা।'

কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই এই কৃত্রিম ইসলামি তাহজিব ও তমদ্দুনের নির্মীয়মাণ গজদন্তমিনার ভেঙে পড়লো, কেননা মিথ্যা ও প্রোপাগাণ্ডার চোরাবালির ওপর ভিত্তি করে তা গড়ে উঠেছিলো। এর বদলে বুদ্ধিজীবীরা খুঁজে পেলেন তাঁদেব বাস্তব সমাজ-অর্থ-নৈতিক জীবনের সত্যকে, তাঁরা একাত্মবোধ করলেন অগণ্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে—পাল, সেন, মোগল, পাঠান, ইংরেজ ও খান আমলে যাঁদের চেহারার উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এই বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবিগণ সকল উদ্ধত খড়্গাঘাত থেকে রক্ষা করেছেন বাংলা সংস্কৃতিকে এবং ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন আপনাদের আসল সাংস্কৃতিক আদর্শকে –সে আদর্শে বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য আছে, বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সঙ্গীতের অবদান আছে, বাংলার সমগ্র উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যের স্বীকবণ আছে, এমন কি, স্ব স্ব ধর্মীয় ভাবও বোধহয় অবর্তমান নেই।

ভাষা আন্দোলন

সাম্রাজ্য ও সম্পদের লোভে আরব-ইরান থেকে যে মুসলমানরা এ দেশে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে দেশীয় দীক্ষিত মুসলমানদের একটা মৌল পার্থক্য, এমন কি, এ শতাব্দীতেও দুর্লক্ষ্য নয়। মোগল-পাঠানের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সাদৃশ্য বরং যথেষ্ট। উভয় গোষ্ঠীই এদেশে এসে শাসনের নামে শোষণ ও স্বৈরাচারে মত্ত হয়েছেন। এরা কখনোই একাত্ম হননি এ দেশীয়দের সঙ্গে। উপরন্তু স্বদেশীয় ভাষা-সংস্কৃতি এবং খানাপিনার প্রতি আত্যন্তিক আনুগত্যবশত এ দেশেই একটি আপন দেশীয় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে, সেই গণ্ডির মধ্যে তাঁরা বাস করেছেন। আর দেশীয় যে-সব নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধরা বর্ণহিন্দুদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা সুলতানদের কিংবা মিশনারিদের দয়া ও আর্থিক সুযোগসুবিধার প্রলোভনে ইসলাম বা খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও একটি মিল সহজেই চোখে পড়ে। দীক্ষিতদের প্রথম পুরুষের প্রতি হয়তো আধেক আঁখির কোণে তাকিয়ে সুলতান অথবা মিশরানিরা কিঞ্চিৎ দয়া বর্ষণ করেছেন, কিন্তু পরিণামে তাঁরা মিশে গেছেন অগণিত দেশীয়দের ভিড়ে। নতুন নামের আড়ালে আসলে আনুগত্য দেখিয়েছেন পুরোনো ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি। এ ছাড়া আরো একদল ছিলেন, যাঁদের বলা যেতে পারে দোআঁসলা—দোআঁসলা মুসলমান ও দোআঁসলা খৃস্টান (অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান)। এঁরা স্বদেশে চিরদিন পরবাসী—আপনাদের না মোগল পাঠান ইংরেজ বলে ভাবতে পেরেছেন, না

পেরেছেন দেশীয় বলে আপনাদের চিহ্নিত করতে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা আদৌ কোনো নেতৃত্ব দান করেছিলেন, তাঁরা এই দোআঁসলা শ্রেণীর। তাঁদের মাতৃভাষা বাংলা একথা তাঁরা কখনোই স্বীকার করেন নি। কেন না, তাঁরা মনে করতেন বাঙালি মুসলমানরা দেশীয় ও দীক্ষিত এবং সে কারণে অন্ত্যজ। অপর পক্ষে, তাঁদের পূর্বপুরুষরা এসেছেন খোদ আরব-ইরান থেকে। তাঁদের ধমনীতে বহমান খাঁটি আর্য অথবা সেমেটিক রক্ত এবং তাঁদের ভাষা আরবি-ফারসি ঘেষা উর্দু। বাংলাকে মাতৃভাষা বলে স্বীকার করলে পাছে কাঙ্ক্ষিত কৌলীন্যের হানি হয় এ আতঙ্কে নবাব আবদুল লতীফের মতো পূর্ব বঙ্গীয় বাঙালকে পর্যন্ত ভাণ করতে হতো উর্দুভাষী রূপে। যেহেতু অবাঙালিত্বই ছিলো তখন আভিজাত্যের মাপকাঠি, সে কারণে নবাব আবদুল লতীফ অথবা সৈয়দ আমীর আলী ইংরেজি চর্চার অপরিহার্যতার কথা অনুধাবন করলেও, বাংলাকে আদৌ বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা কিংবা শিক্ষার বাহন হিশেবে মেনে নেননি। মুসলমানদের শিক্ষাসম্প্রসারণের চেষ্টা করেছিলেন এই দুই নেতা। তাঁদের আন্তরিকতা অনস্বীকার্য, কিন্তু বাঙালি মুসলমানদের জন্যে মাদ্রাসা-ঘেষা যে শিক্ষাব্যবস্থার সুপারিশ করেছিলেন এঁরা, তা কিছু সংখ্যক মুসলমানের আপাত প্রতিষ্ঠা দিলেও, বাঙালি মুসলমান-সমাজকে অন্তত অর্ধ-শতাব্দী পিছিয়ে দিয়েছে। তাঁদের দৃষ্টির অনচ্ছতা এবং বিজাতীয় মনোভাবের খেশারত দিয়েছেন পরবর্তী মুসলমান জেনারেশন।

উচ্চবিত্ত ও তথাকথিত কুলীন মুসলমানদের সঙ্গে পল্লীর বিপুল সংখ্যক কৃষক শ্রমিক মুসলমানদের ধ্যানধারণার আদৌ কোনো মিল ছিলো না। ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে দেশীয়দের ভেতর থেকে মধ্যবিত্ত মুসলমানদের একটি শ্রেণী গড়ে উঠতে

অনেক সময় লেগেছিলো। প্রকৃত পক্ষে, এ শ্রেণীর উদ্‌ভব সম্ভব হয়েছে স্বাধীনতা অর্জনের পরেই। এই মধ্যবিত্তদের মাতৃ-ভাষা বাংলা এবং তা স্বীকার করতে গিয়ে কোনো হীনমন্যতা তাঁদের মনকে পীড়িত করেনি। উপরন্তু চরম ত্যাগের মধ্য দিয়েই তাঁরা মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর নির্ভর করে দেশবিভাগের যে আন্দোলন পরিচালিত হয়, তাঁর নায়ক ছিলেন কুলীন নবাবরা—উর্দুকে যাঁরা মাতৃভাষা বলে গণ্য করতেন। এঁদের পক্ষে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিশেবে কল্পনা করা অস্বাভাবিক ছিলো না। তদুপরি পাকিস্তানের কিম্ভূত ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভাষা-সংস্কৃতির সর্বাত্মক বৈসদৃশ্য একটি সংহত রাষ্ট্র গঠনের প্রতিকূল, মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ও তাঁর চেলারা এ সত্য ভালো-ভাবেই জানতেন। এই জন্যে, প্রথম থেকেই তাঁরা ভাষা ও সংস্কৃতিকে একটি ছাঁচে ফেলে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁরা ভৌগোলিক দূরত্ব জয় করতে চেয়েছিলেন ধর্মের জিগির তুলে এবং জনগণকে সর্বদা ভারতীয় জুজুর ভয় দেখিয়ে।

বাংলা ও বাঙালির প্রতি শাসকবর্গের মনোভাব মুখোশমুক্ত হয়ে প্রকাশ পায় দেশবিভাগের অব্যবহিত পরেই। তৎকালীন পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছেন এই বৃদ্ধ দেশ-প্রেমিক ও রাজনীতিক) ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারির গণ-পরিষদের অধিবেশনে প্রস্তাব করেন যে, ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলা ভাষাও যেন পরিষদের অন্যতম ভাষা হিশেবে মর্যাদা লাভ করে। ২৫শে ফেব্রুয়ারি এ প্রস্তাব নিয়ে পরিষদে আলোচনা চলে। লিয়াকত আলী খান, পাকিস্তানের সে সময়কার প্রধান-মন্ত্রী, এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। কেননা তিনি

পাকিস্তানের সহজাত দুর্বলতার কথা ভালোভাবে জানতেন। ভৌগোলিক ও ভাষা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন একটি দেশের দুটি অংশের মধ্যে কোনো জাতীয়তা ও সংহতি বোধ যে কেবল ধর্মের নামে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, যে কোনো সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকের কাছে তা সুস্পষ্ট। উভয়াংশের জনগণের ধর্মীয় ঐক্য ব্যতীত ভাষাগত একটি কৃত্রিম মিল যদি সৃষ্টি করা যায় তা হলে পাকিস্তান হয়তো টিকেও যেতে পারে, অথবা তেমন অবস্থায় পূর্ব বাংলাকে অন্তত দীর্ঘকাল শোষণ করা চলতে পারবে ইসলামের দোহাই দিয়ে, পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদীরা তা বুঝেছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তানের সব চেয়ে দুর্বল স্থানে আঘাত করায় স্বাভাবিকভাবেই লিয়াকত আলী সকল ভদ্রতা ও কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তিনি রাষ্ট্রের প্রতি ধীরেন্দ্র-নাথ দত্তের আনুগত্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। শ্রীদত্ত তার প্রস্তাবে বলেছিলেন যে, পাকিস্তানের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসীর মাতৃভাষা বাংলা গণ-পরিষদের অন্যতম ভাষা হওয়া উচিত। যদিও এ প্রস্তাব অত্যন্ত গণতান্ত্রিক এবং যুক্তিযুক্ত, তথাপি লিয়াকত আলী বলেন, 'প্রথমে এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নির্দোষ বলে আমি মনে করেছিলুম। কিন্তু বর্তমানে মনে হয় পাকিস্তানের অধি-বাসীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা এবং একটি সাধারণ ভাষার ঐক্যসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।'

একটি ন্যায্য দাবির কী শোচনীয় অগণতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক উত্তর একটা তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী দিতে পারেন তার তুলনাহীন দৃষ্টান্ত হিশেবে বর্তমান জবাবটি বিবেচিত হতে পারবে। স্বৈরাচারী লিয়াকত আলীর পরিচয় আরো স্পষ্ট হয় তাঁর উত্তরের অন্য অংশ থেকে: 'এখানে এ প্রশ্নটা তোলাই ভুল হয়েছে। এটা আমাদের জন্যে একটা জীবন মরণ সমস্যা।

আমি অত্যন্ত তীব্রভাবে এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করি এবং আশা করি এ ধরনের একটি সংশোধনী প্রস্তাবকে পরিষদ অগ্রাহ্য করবেন।'

অন্য একজন মন্ত্রী, গজনফর আলী খান, লিয়াকত আলীর সমর্থনে বলেন, 'পাকিস্তানের একটি সাধারণ ভাষা থাকবে সে ভাষা হচ্ছে উর্দু। উর্দু কোনো প্রদেশের ভাষা নয়, তা হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতির ভাষা। এবং উর্দু ভাষাই হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতি।'

পূর্ব বাংলাব তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ঢাকার নবাব পরিবারের দোআঁসলা বাঙালি মুসলমান, খাজা নাজিমুদ্দীন প্রভুর স্বরে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীরই এই মনোভাব যে একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।' অথচ নাজিমুদ্দীন পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে সে প্রদেশেব জনগণের মতামত গ্রহণ করেননি। আপন দায়িত্বেই দায়িত্বহীন এ উক্তি করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, নাজিমুদ্দীন তমিজুদ্দিন প্রভৃতি পশ্চিমী দালালদের মীরজাফিরর ফলেই পূর্ব বাংলায় পরবর্তীকালে সুদীর্ঘ ও সীমাহীন শোষণ ও নিপীড়ন পরিচালনা করতে পেরেছেন পশ্চিমী ঔপনিবেশিক শক্তি।

কিন্তু নীরবে বিনা প্রতিবাদে বাঙালিরা এ অপমান ও অত্যাচারকে মেনে নেননি। গণপরিষদে রাজকুমার চক্রবর্তী ধীরেন দত্তের প্রস্তাবের সমর্থন করে বলেন, 'পূর্ব বাংলা কেন্দ্রীয় রাজধানী থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, তদুপরি এখন আবার বাঙালিদের ওপর একটা ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটাকে গণতন্ত্র বলে না। এ হচ্ছে অন্যান্যদের ওপর উচ্চশ্রেণীর আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা। বাংলাকে আমরা দেশের উভয়াংশের সাধারণ ভাষা করার জন্যে দাবি জানাচ্ছি না। আমরা শুধু চাই পরিষদের সরকারি ভাষা হিশেবে বাংলার স্বীকৃতি।'

বাংলার স্বপক্ষে যুক্তি যা-ই থাক না কেন, পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের মনোভাব রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে নির্লজ্জ ও নিরাবরণরূপে প্রকাশ পায়। পূর্ব বাংলার ছাত্র ও শিক্ষকগণ তখন থেকেই আপনাদের অসহায় অবস্থার কথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। অতঃপর ২৩ বছর ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের নাগপাশ ছিন্ন করার সংগ্রামী ইতিহাসই পূর্ব বাংলায় রচিত হয়েছে।

পঁচিশে ফেব্রুয়ারি গণপরিষদে বাংলা ভাষার দাবি অগ্রাহ্য হওয়ায় ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারিই ঢাকায় ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ প্রকাশ পায়। এ দিন ছাত্ররা ধর্মঘট পালন এবং প্রতিবাদ সভাব অনুষ্ঠান করেন। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দোসরা মার্চ শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠান তমদ্দুন মজলিশ, প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘ, গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, বিভিন্ন ছাত্রাবাস সংসদ প্রভৃতি নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় ফজলুল হক হলে। এ সভায় যাঁরা যোগদান করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদ, বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা মহম্মদ তোয়াহা, বর্তমান বাংলা জাতীয় লীগের নেতা অলি আহাদ, সাহিত্যিক-সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার, সরদার ফজলুল করীম, কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত আলী, আনোয়ারা খাতুন। সভায় একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং এগারোই মার্চ সমগ্র পূর্ব বাংলায় ভাষার দাবিতে হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

কিন্তু তখনো পর্যন্ত বাংলা ভাষার জন্যে উত্থাপিত দাবির যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পূর্ব বাংলা প্রায় সকল মানুষ অসচেতন ছিলেন। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিশেবে গ্রহণ করলে অথবা বাংলাকে অগ্রাহ্য করলে তা বাংলা ভাষাভাষীদের ওপর পরিণতিতে কী অপূরণীয় ক্ষতি করতে পারে, সে বিষয়ে সাধারণ মানুষরা যথেষ্ট

উদ্‌বিগ্ন ছিলেন না। কুলীনদের প্রচার অনুসারে অনেকেই এরূপ বিশ্বাস করতেন, বাংলা ভাষার দাবিতে যাঁরা সোচ্চার ও বিক্ষুব্ধ, তাঁরা আসলে ভারতের দালাল। এই আত্মঘাতী মনোভাব থেকেই তাঁরা এ আন্দোলনের সঙ্গে বিযুক্ত থেকেছেন, এমন-কি, এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়েছেন। এ কারণেই দেখতে পাই, ধর্মঘট আহ্বানকারী ঢাকার ছাত্ররা একাধিক স্থানে দালালদের ভাড়া-করা গুণ্ডাদের কিংবা সাধারণ মানুষের হাতে প্রহৃত হয়েছেন। অথবা সিলেটে একদল দালাল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে দাবি জানিয়েছেন এবং হামলা করেছেন বাংলার দাবি যাঁরা উত্থাপন করেছিলেন তাঁদের প্রতি।

কিন্তু মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল কাসেম, অজিত গুহ প্রমুখ শিক্ষক এবং পূর্বোক্ত ছাত্র নেতাগণ রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটির গুরুত্ব ও মর্ম যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁদের নেতৃত্বেই এগারোই মার্চ ঢাকার সর্বত্র আংশিক হরতাল পালিত হয়। পুলিশের লাঠি-চার্জ ও অন্যান্য নিপীড়নে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র আহত হন এবং এদের মধ্যে কয়েকজনকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়। বিক্ষোভ দমন করার জন্যে পুলিশ লাঠি চালাতে বাধ্য হয়—এর দ্বারা বিক্ষোভের তীব্রতা সহজেই অনুমান করা সম্ভব। কিন্তু আহতের সংখ্যা, বিক্ষোভের তীব্রতা, অথবা হরতালের সার্থকতার চেয়ে যা মনোযোগ আকর্ষণ করে তা এ আন্দোলন সম্পর্কে সরকারি মনোভাব। একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সরকার এগারোই মার্চের আন্দোলন সম্বন্ধে বলেন, 'আজ ঢাকাতে কিছু সংখ্যক অন্তর্ঘাতক ও একদল ছাত্র ধর্মঘট পালন করার চেষ্টা করে। শহরের সমস্ত মুসলিম এলাকা এবং অধিকাংশ অমুসলিম এলাকাগুলি ধর্মঘট পালন করতে অসম্মত হয়। শুধুমাত্র কিছু কিছু হিন্দু দোকানপাট বন্ধ থাকে।...খানাতল্লাশির ফলে যে সমস্ত প্রমাণাদি এখন সরকারের হস্তগত হয়েছে তার

থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে হতবুদ্ধি সৃষ্টি করে পাকিস্তানকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলেছে।' বাংলা ভাষার জন্যে ন্যায্য দাবি জানালে তা হয় অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ অথবা হিন্দুদের চক্রান্ত—এটা হচ্ছে সে সময়কার পাকিস্তান সরকারের হীন ষড়যন্ত্রের ও মনোভাবের উলঙ্গ প্রকাশ।

এগারোই মার্চ ঢাকার বাইরেও খুলনা, যশোর, রাজশাহি প্রভৃতি স্থানে হরতাল পালিত হয়। খুলনা ও যশোরে পুলিশের সঙ্গে জনগণের রীতিমতো সংঘর্ষ বাধে। তার ফলস্বরূপ অনেকে আহত হন এবং বন্দীর সংখ্যাও ছিলো যথেষ্ট। তথাপি সত্যের খাতিরে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন প্রধানত ঢাকার ছাত্র, শিক্ষক ও মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর মধ্যেই সীমিত ছিলো, তা কোনো ব্যাপক গণসমর্থন লাভ করতে পারেনি।

তবে এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি; কেননা এর প্রচণ্ডতার মুখে দুটি লাভ হয়েছিলো। প্রথমত, আন্দোলনকারীদের বক্তব্য ধীরে ধীরে বৃহত্তর সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলো এবং এর যৌক্তিকতা স্বীকৃত হয় ব্যাপকভাবে। দ্বিতীয়ত, প্রাদেশিক সরকারও তার মনোভাব পরিবর্তন করতে আংশিকভাবে বাধ্য হন। এর ফলে, গণ-পরিষদের কাছে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ না জানালেও, প্রাদেশিক সরকারের কাজ-কর্মের জন্যে বাংলার যথাসম্ভব ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিতে নাজিমুদ্দীন সরকার বাধ্য হন।

বাংলা ভাষা ও পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তানের নেতাদের মনোভাব আর একবার স্পষ্ট হয় মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা সফরের সময়ে। ১৯৪৮ সালের উনিশে মার্চ তিনি ঢাকা আগমন করেন। তখন পর্যন্ত তাঁর জনপ্রিয়তা ছিলো প্রশ্নাতীত। সাধারণ

বাঙালিরা তাঁকে কায়দে আজম বা শ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবেই জ্ঞান করতেন কিন্তু তাঁর স্বার্থান্ধতা অথবা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে জানতেন না। যেহেতু এগারোই মার্চের ভাষা-আন্দোলনের এক সপ্তাহ পরেই তিনি পূর্ব বাংলায় আগমন করেন, অতএব শিক্ষিতসমাজ আশা করেছিলেন এই তথাকথিত জাতির পিতা বাংলার দাবির প্রতি প্রাপ্য মর্যাদা দান করে সরকারি নীতি ঘোষণা করবেন। শিক্ষিতসমাজের এ অতিরিক্ত আশার কারণ, তারা বিমাতার কথা জানতেন, বিপিতার কথা কখনো শোনেননি। কিন্তু মুহম্মদ আলী জিন্নাহর প্রদত্ত একুশে মার্চের রেস কোর্সের ভাষণে বিপিতাসুলভ আচরণটি অভ্রান্তরূপে প্রকাশ পেলো। তিনি পাকিস্তানের অধিকাংশ জনগণের মাতৃভাষা বাংলার গণতান্ত্রিক দাবির প্রতি অপরিসীম অনীহা ও অবহেলা প্রদর্শন করে ঘোষণা করেন, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' যারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার দাবি জানিয়েছিলেন তাঁদের সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এরা প্রকৃতপক্ষে বিদেশের অর্থভোগী দালাল এবং এদের লক্ষ্য ভাষার প্রশ্ন তুলে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করা ও জাতীয় সংহতিতে ফাটল ধরানো। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, মুসলমানরা সবাই বহিরাগত এবং সে কারণে দেশীয়দের সঙ্গে এদের কোনো সামঞ্জস্য হতে পারে না। মুসলমানদের জাতীয়তাবোধ একান্তভাবে ধর্ম-ভিত্তিক। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের একমাত্র রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য দলগুলি হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ও অন্তর্ঘাতমূলক।

জিন্নাহ সাহেবের মতো ভণ্ড গণতান্ত্রিক নেতা এ দেশে আদৌ জন্মে থাকলে, তাঁদের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। এ জন্যেই তিনি রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে আপন মতকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, অবজ্ঞা করেছেন অগণ্য দেশবাসীর প্রাণের দাবিকে। অথবা

দেশের হিন্দু নাগরিকদের প্রতি প্রকাশ করেছেন সন্দেহ ও তাঁদের দিয়েছেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা। জিন্নাহ সাহেবের এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব নির্ভুলভাবে ব্যক্ত হয়েছে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে তিনি ঢাকার ছাত্র নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের দুজন করে প্রতিনিধি তাঁর কাছে গমন করেন। তিনি প্রথম বার তাঁদের ফিরিয়ে দেন, কেননা দলের মধ্যে জগন্নাথ হলের দুজন হিন্দু প্রতিনিধি ছিলেন। তারপর দ্বিতীয় বৈঠকে তিনি মুসলমান প্রতিনিধিদের হিন্দুদের কল্পিত ষড়যন্ত্র ও ভারতের কল্পিত জুজুর বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়ে একযোগে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে কাজ করতে উপদেশ দান করেন। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে ছাত্র নেতাদের সকল যুক্তিকে তিনি নানা-মিথ্যার অজুহাতে অগ্রাহ্য করেন।

কিন্তু সকল একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার বীজ উপ্ত ছিলো পূর্ব বাংলার ছাত্রদের মধ্যে। তাই জিন্নাহ সাহেবের সমাবর্তন ভাষণে চব্বিশে মার্চ তিনি যখন পুনরায় ঘোষণা করেন যে, একমাত্র উর্দু্‌ই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, তখন ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই তারস্বরে না, না, বলে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন। সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে অবিসংবাদিত জাতির পিতার বিরুদ্ধে এ প্রতিবাদই যথেষ্ট সংসাহসের পরিচায়ক। এই, 'না না' চীৎকার পাকিস্তানের একছত্র নায়কের আত্মবিশ্বাসের টনক নাড়িয়েছিলো। তাই পরমুহূর্তে তিনি আপন বক্তব্য শুধরে বলেছিলেন, ভাষার প্রশ্নটি নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই মীমাংসা করবেন। সৌভাগ্যক্রমে জিন্নাহ সাহেব সে বছরই মারা যান। নচেৎ ১৯৫২, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯ ও ১৯৭১-এর ঢাকাকে তিনি প্রত্যক্ষ করে উপলব্ধি করতেন, যত শক্তিশালী হোক, ডিকটেটরশিপ আসলে কত দুর্বল।

রাষ্ট্রনীতিক হিশেবে জিন্নাহ সাহেব অত্যন্ত চতুর ও ফন্দিবাজ ছিলেন। তিনি জানতের উর্দু ও বাংলা দুটি ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে

গৃহীত হলে পাকিস্তানের উভয়াংশের দুর্বল যোগসূত্র আরো দুর্বল হয়ে পড়বে। এবং পরিশেষে বিচ্ছিন্নতাই হবে একমাত্র পরিণাম। হয়েছেও তাই। এতোগুলো লোকের মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করলে তার প্রতিক্রিয়া যে অবশ্যম্ভাবী, এটা অবশ্য এক-দেশদর্শী জিন্নাহ সাহেব ভেবে দেখেননি। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের ওপর সরকারি বাঁধন অত শক্ত ছিলো বলেই ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন সারা পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে দাবা-নলের মতো।

১৯৫২ সালের ছাব্বিশে জানুআরি পাকিস্তানের তখনকার প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন ঢাকার একটি সভায় ঘোষণা করেন যে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার ছাত্ররা, যাঁরা অনেক দিন পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে প্রায় নীরব ছিলেন, পুনরায় সোচ্চার ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। সাতাশে জানুআরি নতুন কর্মপন্থা গ্রহণের নিমিত্ত ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনে ছাত্রনেতারা সমবেত হলেন। গৃহীত হলো ভাবী কর্মসূচী। গাজিউল হকের নেতৃত্বে ছাত্ররা স্থির করলেন তিরিশে জানুআরি সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হবে। সেদিন দেখা গেলো ১৯৪৮ সালের সঙ্গে ১৯৫২ সালের বড়ো একটা ব্যবধান চার বছরের স্বল্পসময়ের মধ্যেই রচিত হয়েছে। এবারের আন্দোলনে ছাত্র-ছাত্রীদের যে অংশগ্রহণ তা একান্তভাবেই স্বতঃস্ফূর্ত। ১৯৪৮ সালে যেখানে ভাষা আন্দোলন ছিলো সংখ্যালঘু অর্থাৎ কিছুসংখ্যক মানুষের আন্দোলন তা-ই ১৯৫২ সালে রূপ নিলো গণ-আন্দোলনের।

এ আন্দোলন এবার কেবলমাত্র ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো না। মুসলিম লীগ ছাড়া অন্যান্য সবগুলো রাজনৈতিকদল পর্যন্ত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যোগ দিলেন এ সর্বব্যাপী আন্দোলনে।

তিরিশে জানুআরি ডিস্ট্রিক্ট বার লাইব্রেরি হলে একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এতে থাকলেন আওয়ামি মুসলিম লীগ, যুব লীগ, খিলাফতে রব্বানি, ছাত্র লীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে দুজন করে সদস্য। শেখ মুজিবুর রহমান তখন জেলে। আওয়ামি লীগ থেকে নির্বাচিত হলেন আতাউর রহমান খান ও কাজী গোলাম মাহবুব। এ সংগ্রাম পরিষদে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মহম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ ও আবদুল মতিন।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে তিরিশে জানুআরির পর পুনরায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয় চৌঠা ফেব্রুআরি। সেদিন অপরাহ্নে এক জনসভায় মৌলানা ভাসানী প্রমুখ জননেতা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার জন্যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে তাঁরা সতর্ক করে দেন যে, একুশে ফেব্রুআরি প্রদেশব্যাপী বাংলাভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালন করা হবে।

এদিকে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশন শুরু হবার কথা একুশে ফেব্রুআরি। পাছে সেদিন কোনো গোলযোগের সৃষ্টি হয় এই আশংকায় বিশে ফেব্রুআরি সরকার ১৪৪ ধারা জারি করলেন। কিন্তু গাজিউল হক, আবদুল মতিন, কমরুদ্দীন, হাবীবুর রহমান শেলী, জিল্লুর রহমান, আবদুস সামাদ, এম. আর. আখতার, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী প্রমুখ ছাত্রনেতা সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবেন। যথারীতি পরের দিন সরকারি আইন আর আইনের রক্ষক পুলিশ বাহিনীকে অগ্রাহ্য করে ছাত্র-ছাত্রীরা বেরিয়ে পড়লেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে। পুলিশ বন্দী করলো, লাঠি চালালো, টিয়ার গ্যাস শেল ফাটালো, পরিশেষে হুশিয়ার না করে গুলি চালালো। শহীদ হলেন কিশোর জব্বার ও রফিক, শহীদ হলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম এ শ্রেণীর ছাত্র বরকত।

গুলি আর নির্বিচার নিপীড়নের খবর পৌঁছলো পরিষদ ভবনে। নির্লজ্জ ও অমানুষ মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন তবু পরিষদের অধিবেশন চালিয়ে যেতে চাইলেন। প্রতিবাদে বিরোধী দলীয় সকল এবং সরকার পক্ষের কয়েকজন সদস্য পরিষদ ত্যাগ করে চলে এলেন বাইরে। পরের দিন সংবাদপত্রে খবর বেরোলো ৩ জন নিহত হয়েছেন, আহতের সংখ্যা ৩০০ আর বন্দীর সংখ্যা ২০০।

বাইশে ফেব্রুআরি ছাত্র-জনতা শহীদদের জানাজা পড়ে, তাঁদের রক্তমাখা কাপড়ের পতাকা উড়িয়ে বেরিয়ে এলেন প্রশস্ত সড়কে। বিশাল শোক মিছিল ঢাকার পথ ধরে এগিয়ে চললো নীরব মুখে, নত মস্তকে। হঠাৎ এই শান্তিপূর্ণ মিসিলের ওপর আক্রমণ চালালো পুলিশের বর্বর বাহিনী। গুলিতে শহীদ হলেন আইন বিভাগের ছাত্র শফিকুর রহমান, আবদুস সালাম, একজন অন্ধ ভিক্ষুক, একটি কিশোর। সরকারী ভাষ্য অনুসারে এদিন নিহত হয়েছিলেন ৫ জন এবং আহতের সংখ্যা ১২৫। আহতদের মধ্যে ছিলেন শেরে বাংলা ফজলুল হক। ছাত্রপরিষদ আহতের সংখ্যা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি, কিন্তু ৩৯ জন নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছিলেন।

প্রবল বিক্ষোভের মুখে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন চব্বিশে ফেব্রুআরি অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। চব্বিশে ফেব্রুআরি থেকে আঠাশে ফেব্রুআরির মধ্যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র, শিক্ষক ও রাজনীতিকদের গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন অলি আহাদ, মহম্মদ তোয়াহা, অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ, অধ্যাপক অজিত গুহ, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, পরিষদ সদস্য খয়রাত হোসেন, মৌলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও মৌলানা ভাসানী। এ ছাড়া গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকায় গাজিউল হক প্রমুখ নেতা আত্মগোপন করেন।

ঢাকায় ধীরে ধীরে বিক্ষোভ স্তিমিত হয়ে এলো বটে কিন্তু

ততদিনে মফস্বল শহর ও গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে ঢাকার প্রবল প্রাণের বন্যা। সারা প্রদেশের ছাত্র কৃষক, শ্রমিক তথা সমগ্র জনগণের অন্তরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদরূপ আগুনের পরশমণির স্পর্শ লেগে তা শুদ্ধ হলো, শক্তি লাভ করলো ; দানবের সঙ্গে ভাবী সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হলো।

১৯৫২ সালের ফেব্রুআরি আন্দোলন প্রকৃত পক্ষে পূর্ব বাংলার সত্যিকার গণতান্ত্রিক চেতনা লাভের প্রথম উজ্জ্বল স্বাক্ষর। এ আন্দোলন ভাষাকে কেন্দ্র করে ঘনীভূত হলেও, ভাষার দাবিতেই তা গণ্ডিবদ্ধ থাকেনি। পূর্ব বাংলার স্বাধিকার সংগ্রামের সূচনা করেছে এ আন্দোলন এবং এর সার্থকতা ও সফলতা বারংবার অনুপ্রেরণা ও দুর্দমনীয় সঙ্কল্পের জন্ম দিয়েছে পূব বাংলার বঞ্চিত ও প্রতারিত মানুষের মনে। ঢাকার 'শহীদ মিনার' সংগ্রাম ও সফলতার প্রতীক।

মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি মানুষের যে অকৃত্রিম দরদ ও সেন্টিমেণ্টাল মূল্যবোধ থাকে, তা আহত হয়েছিলো বলেই, জনগণের প্রতিরোধ এবং বাংলাপ্রীতি সহসা বৃদ্ধি পেয়েছিলো। শাসকচক্র মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে আনতে চাইলেন বলেই মাকে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরলেন পাঁচ কোটি বাঙালি সন্তান। সহজাত দরদ আরোপিত সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে দীর্ঘকাল আবদ্ধ রাখা যায় না, তা এক সময়ে প্রকাশ পাবেই। এই কারণে, ১৯৫২ সালে যে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন হলো তা আর কতিপয় ছাত্র ও শিক্ষকের ভেতর গণ্ডিবদ্ধ হয়ে থাকেনি। আপামর জনসাধারণ তার শরিক হয়েছেন। এ হচ্ছে স্বল্পতম কালে পূর্ব বাংলার ব্যাপকতম চিত্তজাগরণের স্বাক্ষর। যে ভাষাকে একদিন শিক্ষিত মুসলমানরা দেখেছেন আত্যন্তিক অনীহার সঙ্গে, তার জন্যে বুকের রক্ত দিলেন নবজাগ্রত যুবকরা। বাংলা হলো তাঁদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তারপর যতদিন অতিবাহিত হয়েছে, বাংলা ভাষা ও

সাহিত্যের প্রতি সকল মানুষের ভালোবাসা ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। সে ভালোবাসা যেমন আন্তরিক তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বোধহয় কেবল ভাষার প্রশ্নে ৩০৯টি আসনের মধ্যে ৩০০টি আসনেই মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। মুখ্য (মূর্খও) মন্ত্রী নুরুল আমীন পরাস্ত হন পঁচিশ বছরের এক যুবক খালেক নওয়াজ খানের কাছে। অন্যান্য নেতাদের মধ্যেও কেউ নির্বাচিত হতে পারেননি। যুক্তফ্রন্ট কিন্তু এ অভূতপূর্ব বিজয় লাভ সত্ত্বেও, ক্ষমতায় আসীন থাকতে পারেননি। তার জন্যে দায়ী কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানি কায়েমি স্বার্থবাদীরা। তাঁরা পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে চিরকালই ভয়ের চোখে দেখেছেন। এজন্যে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে গণতান্ত্রিক শক্তির উন্মেষ ও বিজয় দৃষ্টে স্বভাবতই তাঁরা শঙ্কিত হয়েছেন। তদুপরি যুক্তফ্রন্ট সংস্কৃতির প্রশ্নে যুক্তবঙ্গ স্থাপন করবেন এই আশঙ্কায় কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্টকে পদচ্যুত করলেন মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে গবর্নর জেনারেলের শাসন জারি করে। তবু রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে না এলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করে বাঙালিরা একটি অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি ধীরে ধীরে রূপ দিতে থাকেন। এই সংস্কৃতি একান্তভাবে পূর্ব বঙ্গীয়, পড়ে-পাওয়া নয়, বুকের তাজা রক্তের চরম মূল্য দিয়ে অর্জন করতে হয়েছে একে। সুতরাং সে অত্যন্ত আপন পূর্ব বাংলার কাছে।

পরিণতিতে এই সংস্কৃতিই জনগণের মনে বাঙালি জাতীয়তা-বোধের জন্ম দিতে সহায়তা করেছে। বাঙালি বলে আত্মপরিচয় দিতে এবং বাংলার জয় ঘোষণা করতে পূর্ববাংলা উদ্‌বুদ্ধ হয়েছে এ পথেই। কেবল যদি অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক দমননীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন বাঙালিরা, তা হলে সে আন্দোলন বোধহয় 'পাক-বাংলা'র স্বশাসন অথবা স্বাধীনতার জন্যে পরিচালিত হতো। কিন্তু সোনার বাংলাকে এবং ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে

'সাম্প্রদায়িকতা ও রবীন্দ্রবিরোধিতা'

বহু শতাব্দী থেকে এ দেশের পল্লীতে হিন্দু ও মুসলমানরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করেছে। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে তো বটেই, এমন কি, ধর্মীয় চেতনায়ও তারা সমন্বয় সাধন করেছেন। বৈষ্ণব দর্শনের পশ্চাতে সূফী প্রভাব ঠিক কতখানি আজো তা গবেষণার বিষয়। কিন্তু পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, সে প্রভাব যথেষ্ট গভীর। তা ছাড়া বৈষ্ণবদের সাম্যবাদী আদর্শও ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীর দ্বারা প্রভাবিত। সহজিয়াদের সাধনায় অথবা কবীরের ধর্মেও ইসলামের মানবিক আদর্শ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। কবীরের সদ্‌গুরু ও সত্যপীর এক কিনা অথবা সত্যপীরের কল্পনায় কবীরের সমন্বয়ধর্মী মনোভাব কাজ করেছে কিনা জানিনে; কিন্তু সত্যপীর হিন্দু-মুসলমানের যুগল আদর্শের সংশ্লেষিতরূপ। হিন্দু ও মুসলমানের এই ভাবের সমন্বয় অত্যুজ্জ্বলভাবে বিধৃত আছে এ দেশের সাহিত্য, সঙ্গীত, জ্যোতিষ ও ইতিহাসে। বৈষ্ণব পদাবলী, বাউল গান, সত্যপীরের পাঁচালি, ময়মনসিংহ গীতিকা এবং বিপুল পল্লী সাহিত্য ও সঙ্গীতে হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ী ভাবাদর্শ অকৃত্রিমরূপে প্রতিফলিত হয়েছে।

এই জন্যেই, শুধু ধর্মীয় কারণে হিন্দু ও মুসলমান দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিরোধ বেধেছে, ইতিহাস সেরূপ সাক্ষ্য দেয় না। সমাজ-অর্থনৈতিক কারণে উদ্‌ভূত উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের অন্তর্দ্বন্দ্বের মতো, উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সকল মানুষের মধ্যে একটা শ্রেণীসংগ্রাম চিরকালই চলে এসেছে। ইংরেজদের আগমনের

পর বহু সাধারণ হিন্দু ব্যবসাবাণিজ্য করে অথবা ইংরেজি শিখে রাতারাতি মধ্যবিত্তে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু উচ্চবিত্তের নাগরিক মুসলমানগণ ইংরেজদের ওপর গোঁসা করে এবং বিত্তহীন গ্রামের মুসলমানরা সুযোগের অভাবে, আপনাদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারেন নি। এর ফলে, অল্প দিনের মধ্যেই হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দেয়, তার প্রত্যক্ষ ফল উনবিংশ শতাব্দীর সুস্পষ্ট সাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ। হিন্দু-মুসলিম বৈরীর মূল কারণ রবীন্দ্রনাথ কবি হয়েও বুঝতে পেরেছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি বলেছিলেন, একমাত্র অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতেই এই উভয় সম্প্রদায়ের মৈত্রী স্থায়ী হতে পারে। দেশবিভাগের পরে আকস্মিক প্রতিযোগিতার অভাব ঘটাতে এবং সুযোগ বৃদ্ধির ফলে পূর্ব বাংলায় স্বল্পকালের মধ্যে একটি বৃহৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে। এ রাই অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির লালন করেছেন। ১৯৪৮ সালে যে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত তা-ই ১৯৫২ সালে এ শ্রেণীর ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতায় সার্বজনিক রূপ নেয়।

ফেব্রুআরি আন্দোলনের তীব্রতার মুখে পাকিস্তানেব চরম অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচাবী সরকারকেও আতঙ্কিত হয়ে বাংলা ভাষার দাবি মেনে নিতে হয়। আন্দোলনের তীব্রতা এ আতঙ্কের কারণ নয়, আতঙ্ক ভাবী বাংলা সংস্কৃতিকে। সেহেতু সরকার নতুন পরিকল্পনা নিলেন বাংলা সংস্কৃতিকে খর্ব করার। ১৯৪৭ সালের পূর্ববর্তী বাংলার সকল ঐতিহ্যকে ভুলে গিয়ে, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এক সবুজ বিপ্লব আনয়নের আহ্বান জানালেন তাঁরা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত সকল হিন্দু নামকে তাঁরা মুছে ফেলতে উদ্‌যোগী হলেন। বঙ্কিমের বদলে মীর মশাররফ হোসেন, রবীন্দ্র-নাথের বদলে নজরুলকে এঁরা দাঁড় করালেন। প্রকৃতপক্ষে, বাংলা সংস্কৃতি-বিরোধিতার প্রতীক হলো রবীন্দ্র-বিরোধিতা। সরকারের সাংস্কৃতিক দালালারা চাইলেন রবীন্দ্রনাথকে নানা উপায়ে শিক্ষা

ও সংস্কৃতি ক্ষেত্র থেকে মুছে ফেলতে। আর বিপুল সংখ্যক সংস্কৃতিসেবীরা চাইলেন তাঁর আপন মহিমায় রবীন্দ্রনাথকে প্রতিষ্ঠিত করতে। এই টানাপোড়েন প্রবলভাবে শুরু হয় ১৯৬১ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকীকে উপলক্ষ করে। আজাদ পত্রিকার সম্পাদক একান্ত প্রতিক্রিয়াশীল মওলানা আক্রাম খা ও সরকারের অন্যান্য দাললরা এ সময়ে বলতে শুরু করেন যে, রবীন্দ্রনাথ মুসলমান নন, রবীন্দ্রনাথ পাকিস্তানি নন, রবীন্দ্রনাথ মুসলিম সমাজ নিয়ে লেখেননি এবং রবীন্দ্রনাথ মুসলিমদের বিরুদ্ধে লিখেছেন; সুতরাং পাকিস্তানের পাকমাটিতে তিনি পরিত্যাজ্য। ধর্মের গোঁড়ামি এঁদের দৃষ্টিকে এমন আবিল করেছিলো এবং এঁদের মন আরব মরুভূমির খেজুরতলার দিকে এমন নিবিষ্ট ছিলো যে, সাম্রাজ্যলোলুপ বিদেশী মুসলমানদের বিরুদ্ধে দেশীয় কোনো শিবাজী লড়াই করে থাকলে এবং রবীন্দ্রনাথ তার প্রশংসা করে থাকলে. সেটা এদের চোখে গণ্য হলো আমর্জনীয় অপরাধ বলে। অথচ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে কোনো মুসলমান সংগ্রাম করে থাকলে, তাঁরা এঁদেরই কাছে বীর সৈনিক বলে প্রশংসিত হলেন। এই একচোখামি তাদের সাধারণ চক্ষুলজ্জা এবং যুক্তিবোধকে পর্যন্ত ঘুচিয়ে দিয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শ্লোগান সবচেয়ে প্রবলতা লাভ করে ১৯৬৫ সালের পাকভারত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। পূর্ব বাংলার তৎকালীন গভর্নর মোমেন খাঁর মতো অর্ধশিক্ষিতের মুখে সংস্কৃতির কথা শুনলে তা অট্টহাস্যের উদ্রেক করতে পারে; কিন্তু তবু তিনি ও তাঁর সাকরেদগণ এ সময়ে রবীন্দ্রবিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

নজরুলকে তাঁরা চিহ্নিত করলেন ইসলামের ধ্বজাধারী হিশেবে। অথচ সাংস্কৃতিক দালাল এই আক্রাম খাঁরা এ শতকের তৃতীয় দশকে নজরুলকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। এমন কি, ১৯৫০ সালে, পাকিস্তান লাভের পরে, গোলাম মোস্তফা একটি

প্রবন্ধে নজরুলের সমন্বয়ধর্মী মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানে সমগ্র নজরুল কোনোক্রমে গৃহীত হতে পারেন না। নজরুলের গুটি কতক ইসলামি গান ও কবিতা ব্যতীত অন্যত্র ইসলাম ধর্মবিরোধী মনোভাব প্রকটিত হয়েছে, এ অজুহাত দেখিয়ে তিনি নজরুলের সংস্কার প্রস্তাব দেন। এবং তদনুসারে 'তমদ্দুন সেবক'রা নজরুলকে গ্রহণ করলেন সংস্কার করে। খণ্ডিত মার্জিত নজরুল নবরূপে প্রকাশিত হলেন পূর্ব বাংলায়। মুসলমানি শব্দ দিয়ে তাঁর কবিতা পুনর্লিখিত হলো ছাত্রদের জন্যে। 'জয়গানে ভগবানে তুষি বর মাগোরে'-এর পরিবর্তে নতুন করে লেখা হলো, 'জয়গানে রহমানে তুষি বর মাগোরে'। তাই বলে 'ভগবান বুকে এঁকে দিব পদচিহ্ন' রহমান বুকে এঁকে দিব পদচিহ্নে পরিবর্তিত হলো না। কিন্তু 'সজীব কবির মহাশ্মশান' নতুন রূপ নিয়ে হলো 'সজীব কবির গোরস্তান'। সরকারি প্রচার যন্ত্রগুলি নজরুলের একটা বিশেষ দিককেই প্রতি-বিম্বিত করতে থাকলো। এই কারণে, কবির কিছু সংখ্যক ইসলামি গানই বারংবার সরকারি বেতার থেকে প্রচারিত হয়েছে। এই সংস্কৃত নজরুলকে অতঃপর দাঁড় করানো হলো রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষরূপে। দশচক্রে স্বয়ং সূর্য ঘুরতে শুরু করলেন উপগ্রহের চতুর্দিকে।

এ শিক্ষাকে ভাবী জেনারেশনের রক্তে মিশিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকার একটি টেকসট-বুক কমিটি গঠন করেন। এই টেকসট-বুক সম্পাদিত ও লিখিত হলো কতিপয় বিবেকবর্জিত অসাধু বুদ্ধি-জীবীদের দ্বারা—যাঁরা সত্যের চেয়ে সরকারি বক্তব্যকেই বেশি মর্যাদা দিয়ে থাকেন। এক-এক শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীদের জন্যে পাঠ্য হলো একটিমাত্র টেকসট-বুক। সাম্প্রদায়িক শিক্ষা দান করাই এ সমস্ত বইয়ের লক্ষ্য। এই জন্যে দেখতে পাই প্রায় সবগুলো বাংলা টেকসট বইয়ের প্রথম লেখাটি ইসলাম ও রসুলকে নিয়ে।—যে প্রবন্ধ ইসলামিয়াতের অন্তর্গত হলেই ভালো হতো

এবং যা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছাত্রদের জন্যে অবশ্যপাঠ্যরূপে কিছুতেই নির্ধারিত হতে পারে না। এ রচনাগুলি উৎকৃষ্ট সাহিত্য হিশেবে অথবা প্রতিনিধিত্বমূলক সাহিত্যিকের রচনা হিশেবে গৃহীত হয়নি, কেবলমাত্র সরকারের সাম্প্রদায়িক নীতির সমর্থনেই নির্বাচিত হয়েছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় রচনা পাকিস্তান বিষয়ক। সেখানে শিশুছাত্র জানতে পারছে পাকিস্তান মুসলমানদের পবিত্র 'ওয়াতন'। স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ইতিহাস তাদের শেখানো হলো, তা নিতান্ত বিকৃত। তারা জানলো তাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা হয়েছে মুসলমানদের জন্মশত্রু হিন্দুদেব কাছ থেকে। এই হিন্দুদের বাসস্থানের নাম হিন্দুস্থান (ভারত কথাটি ওখানকার টেকসট বুক অথবা সরকারি প্রচারযন্ত্রে কখনো উচ্চারিত হয় না)। এই সমস্ত গ্রন্থে নজরুলেব জীবনী আছে। তাতে বলা হয়েছে, দারিদ্র্যের চাপে তাঁর প্রতিভার বিকাশ সম্যকভাবে ঘটতে পারেনি। অপর পক্ষে, রবীন্দ্রনাথ সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছিলেন। (যেন ধনসম্পদই প্রতিভার প্রধানতম শর্ত।) তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ আশি বছর বয়স অবধি লিখেছিলেন, নজরুলও অকালে রোগাক্রান্ত না হলে হয়তো বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হতেন। (যদিও আমরা জানি, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভা বিকাশ লাভ করে খুব অল্প ক্ষেত্রেই। নজরুল সম্পর্কে এ কথা আরো বেশি সত্য, কেননা তাঁর প্রতিভার ও জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ সময় ১৯২১-১৯২৯ সাল। অর্থাৎ কবির ২২ থেকে ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত। তারপর তাঁর প্রতিভা ধীরে ধীরে অস্তমিত হয়েছে। ১৯৪২ সাল অর্থাৎ ৪৩ বছর বয়স পর্যন্ত যদিচ তিনি সক্রিয় ছিলেন, তথাপি শেষ এক যুগের জন্যে তিনি পরিচিত নন, তাঁর খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা তৃতীয় দশকেই ঘটেছিলো।) আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকে রবীন্দ্রনাথ শুধু কার্যত অনুপস্থিত থাকেননি, তাঁর বিরুদ্ধে রীতিমতো প্রচার চালানো হয়েছে।

এ সব প্রচারণার ফল যে কিছু হয়নি, তা নয়। ওখানকার

স্কুল-কলেজের ছাত্ররা অনেকেই নজরুলকে তাঁর সুপ্ত প্রতিভার জন্যে বড়ো করে দেখে এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাবও এদের মধ্যে সহজেই চোখে পড়ে।

/এই সাম্প্রদায়িক প্রচারে খান সাহেবরা নিজেরা অংশগ্রহণ করেননি, তাঁদের বাঙালি দালালরাই এ দুষ্কর্ম সুসম্পন্ন করেছেন। সৈয়দ সাজ্জাদ হুসায়েন, মোহর আলী, গোলাম সাকালায়েন, আশারফ সিদ্দিকী, মহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও মুহাম্মদ মুনিমের মতো শিক্ষক এবং তালিম হোসেন, আ ন.ম. বজলুর রশীদ, ফররুখ আহমদ ও আহসান হাবীবের মতো কবি, এমন কি, কিছু গায়ক-বাদক সরকার সামান্য প্রয়াসেই জোটাতে পেরেছেন। এঁদেরই চক্রান্তে ও সমর্থনে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময়ে বেতার ও টেলি-ভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার নিষিদ্ধ হয়। এই গুরুতর সিদ্ধান্তই রবীন্দ্র-বিরোধিতার চূড়ান্ত বলে গণ্য হতে পারে। এঁদের ধারণা ছিলো একবার রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ হলে একই যুক্তি দেখিয়ে ক্রমশ রবীন্দ্রসাহিত্যের পঠনপাঠনও বন্ধ করা শক্ত হবে না। বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু, মাইকেল, বঙ্কিম, সত্যেন দত্ত, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ অনিবার্যরূপে অতঃপর বহিষ্কৃত হবেন পূর্ব দিগন্ত থেকে এবং দালালদের রদ্দিমাল এরপর বাজারের একমাত্র পণ্যহিশেবে বিকোবে। তার ফলে একচেটিয়া মুনাফা লাভ করবেন এঁরা এবং পশ্চিমী কায়েমি স্বার্থবাদীদের অভিপ্রেত অনুসারে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিও ধীরে ধীরে লুপ্ত হবে।/

কিন্তু শাসক ও দালালদের এই আঘাতই শেষ আঘাত। এরপর বেরিয়ে এসে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা এতকাল সরাসরি সরকারের বিরোধিতা করতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আব্দুল হাই, প্রফেসর সরওয়ার মুরশেদ, ডক্টর আহমদ শরীফ, ডক্টর আনিসুজ্জা-মান প্রমুখ শিক্ষক এবং ডক্টর কুদরতই খুদা, ডক্টর কাজী মোতাহার

হোসেন প্রমুখ বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতি প্রকাশ করে বলেন, পূর্ব বাংলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ অবিচ্ছেদ্য ও অনিবার্য। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ডাঃ মুহম্মদ শাহীদুল্লাহ কোনো পক্ষে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন।)

এরপর এমন সব ঘটনা ঘটতে শুরু করে যার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রপ্রীতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে জগন্নাথ কলেজে রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের যে অভিনয় হয়, কোনো প্রচারণা ছাড়াই তাতে ২০ হাজারের বেশি দর্শক উপস্থিত হন। ১৯৬৬ সালের মে মাসে রবীন্দ্রজয়ন্তীর প্রাক্কালে ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে পুনরায় রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার আরম্ভ হয়। ঢাকার প্রত্যেকটি দৈনিক পত্রিকা জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশ করেন বিশেষ সংখ্যা এবং ইনজিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে 'ছায়ানট', 'ঐকতান' প্রভৃতি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী তিন দিন ব্যাপী জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করেন। এই আড়ম্বর প্রকৃতপক্ষে সরকারি দমননীতিরই প্রতিবাদ। একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা থেকে সে কথা বেশ বোঝা যায়। ইনজিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের অনুষ্ঠানের শুরুতে যে গানটি গাওয়া হয়, তা হলো 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে।' সত্যি সত্যি বাঁধন টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। পূর্ব বাংলা বেরিয়ে এলো মুক্তবুদ্ধির উজ্জ্বল আলোকে।/

অবশ্য এ আন্দোলনের সাফল্য একদিনে আসেনি। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে যে মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীরা সংস্কৃতিকে অকৃত্রিম ও উদার করতে প্রযত্নবান ছিলেন, ভেতরে ভেতরে তাঁরা তাঁদের গণ্ডিকে করছিলেন সম্প্রসারিত। তাঁদের কাছে দীক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীরা ছড়িয়ে পড়ছিলেন পূর্ব বাংলার সর্বত্র। পত্র-পত্রিকায় এঁদের রচনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমন কি, পত্র-পত্রিকাগুলিও একটা অসাম্প্রদায়িক রূপ নিচ্ছিলো। দেশবিভাগের অব্যবহিত পরে যেখানে আজাদ ও ইত্তেহাদ-এর মতো মুসলমানি পত্রিকাই

ছিলো পূর্ব বাংলার একমাত্র সম্পদ, সেখানে কয়েক বছরের মধ্যেই 'ইত্তেফাক', 'সংবাদ' ও 'পূর্বদেশের' মতো বাঙালি চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ পত্রিকা জন্ম নেয় ও ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আইয়ুব শাহীর অবসানে 'দৈনিক পাকিস্তানে'রও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সব সংবাদপত্র ব্যতীত ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা', রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'সাহিত্যিকী', চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'পাণ্ডুলিপি', সেকেন্দার আবুজাফর সম্পাদিত 'সমকাল', জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত 'পূর্বমেঘ', মযহারুল ইসলাম সম্পাদিত 'উত্তর অন্বেষা' প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকা এবং 'পৃথিবী', 'অগত্যা', 'সোনার বাংলা', 'মেঘনা', 'রূপসা', প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষণজীবী সাময়িকপত্র ধীরে ধীরে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্য-সম্পর্কিত ধারণাকেই পালটে দেয়। ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে ইত্তেফাক, সংবাদ প্রভৃতি পত্রিকা যে প্রগতিশীল বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে, তা যেমন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় তেমনি তা পূর্ব বাংলার নতুন চেতনার অভ্রান্ত স্বাক্ষর।

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সাংস্কৃতিক মিলনের পথ প্রশস্ত করেছে কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১৯৫৩ সালে অনুষ্ঠিত শান্তি-নিকেতনের 'সাহিত্যমেলা', ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত ঢাকার 'সাহিত্য সম্মিলন', পিকিং-এ অনুষ্ঠিত শান্তিসম্মিলন এবং পূর্ব বাংলায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মিলনে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি-সেবীদের যোগাযোগ ঘটেছে, সেখানে তাঁরা আপনাপন মতামত বিনিময় করতে পেরেছেন। 'দেশ', 'নবজাতক' প্রভৃতি পশ্চিম-বঙ্গীয় পত্রিকা এবং 'আকাশবাণীর' মাধ্যমেও পূর্ব ও পশ্চিমের সংক্ষিপ্ত কিন্তু কাঙ্ক্ষেয় মিলন ঘটেছে। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পূর্ব বাংলার শহর ও গ্রামে যে বিপুল সাড়া জেগেছিলো তা-ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সরকারি রক্তচক্ষুর নীচে বসেও

এ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। (প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, সনজীদা খাতুন, ইডেনের অধ্যাপিকা, ডি পি আই লিখিতভাবে তাঁকে জানান যে, তিনি যেন কোথাও জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ না দেন অথবা গান না করেন।) কাগমারি সম্মেলনেও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিলো। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুআরি মাসে অনুষ্ঠিত এই রাজনৈতিক সম্মেলন উপলক্ষে কাগমারিতে ৫০টি তোরণ নির্মাণ করা হয়। যাঁদের নামে এ তোরণগুলি নির্মিত হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন এবং সুভাষ বসু।

এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি স্বাভাবিকভাবেই ক্রমশ অসাম্প্রদায়িক ও উদার রূপ নিচ্ছিলো। তার জন্যেই দেখতে পাই, ১৯৬৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় যে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হয় (সংযোজন দ্রষ্টব্য), সেখানে সামান্যতম সাম্প্রদায়িকতাও লক্ষিত হয়নি। বাংলা সাহিত্যের যে রূপটি সেখানে তুলে ধরা হয়, তা একান্তভাবেই প্রতিনিধিত্বমূলক, কোনো ধর্মীয় সংকীর্ণতা এ বিষয়ে উদ্‌যোক্তাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেনি। এ অনুষ্ঠানে যে বিপুল সংখ্যক দর্শক উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন অসাহিত্যিক। ১৯৬৮ সালে ইনজিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে যে 'মহাকবি স্মরণোৎসব' হয় (সংযোজন দ্রষ্টব্য), তাতেও বাংলা সাহিত্যের এই অসাম্প্রদায়িক চরিত্র এবং আপামর জনসাধারণের বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

/সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিত্যাগ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি সকল মানুষের অনুরাগ জন্মানোর জন্যে সবচেয়ে বেশি কাজ করছেন 'ছায়ানট' নামক একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (সংযোজন দ্রষ্টব্য)। 'ধারাপাত', 'জীবন থেকে নেয়া' প্রভৃতি কয়েকটি চলচ্চিত্রও এ বিষয়ে কৃতিত্বের দাবি করতে পারে। তবু এ কথা

বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে ছায়ানটই ঢাকাতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত রীতিমতো চালু ও জনপ্রিয় করেন। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে এঁরা ১৯৬৫ সালের অগস্ট মাসে (অর্থাৎ পাক-ভারত যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে) শিলাইদহতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিবস পালন করেন। এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বহু সংস্কৃতিসেবী ও বুদ্ধিজীবী।/

এই পরিবর্তিত প্রতিবেশে রবীন্দ্রবিরোধী এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিন্দিত হবে প্রায় সকলের দ্বারা, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাই ১৯৬৬ সালে অসাম্প্রদায়িক সাহিত্যের দাবি স্থায়ীভাবে স্বীকৃত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন পূর্ব বাংলায়। এ বছরই বদরুদ্দীন উমর (তাঁর পিতা বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সম্পাদক ছিলেন) সাম্প্রদায়িকতার ওপর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলির প্রথম গ্রন্থ 'সাম্প্রদায়িকতা' প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে তাঁর লেখা অপর দুখানি বিখ্যাত গ্রন্থ 'সংস্কৃতির সংকট' ও 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা।' ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয় আনিসুজ্জামান সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি। উভয় বঙ্গে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথসম্পর্কিত যাবতীয় প্রবন্ধ সংকলনের মধ্যে আলোচ্য বইটি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া, এ সময়েই হায়াৎ মামুদের 'রবীন্দ্রনাথ' প্রকাশিত হয়।

নজরুল সম্পর্কে অকারণ উচ্ছ্বাস ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূরীকরণের ব্যাপারে আহমদ শরীফ, বদরুদ্দীন উমর প্রমুখের প্রবন্ধ এবং মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত 'নজরুল ইসলাম' (১৯৬৯) গ্রন্থখানি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। নজরুল ইসলাম সম্পর্কে পূর্ব বাংলায় এই প্রথম নিরপেক্ষ ও মোহমুক্ত মূল্যায়ন।

১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয় গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর সার্ধশতবর্ষ পূর্তি স্মারকগ্রন্থ'। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হলো মুসলমানদের বাসভূমি পূর্ব বাংলা থেকে, সম্ভবত এটা সেখানকার অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের একটা

বড়ো এবং অভ্রান্ত প্রমাণ।

বাংলা দেশ এভাবে এগিয়ে চলে অসাম্প্রদায়িক মুক্তবুদ্ধির পথে। এরই ফলশ্রুতিস্বরূপ সেখানকার জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচিত হতে পারলো রবীন্দ্রনাথের একটি গান, যে গানে দেশকে 'মা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক পটভূমি

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পশ্চাতে সাংস্কৃতিক অনেক কারণ ছিলো, সন্দেহ নেই। বাঙালি সংস্কৃতিকে স্বাধীনতার পর থেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন পশ্চিমে পাকিস্তানি কায়েমি স্বার্থবাদীরা। কেননা পূর্ব ও পশ্চিমের অতি দুর্বল সাংস্কৃতিক যোগসূত্রকে তাঁরা মজবুত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণের কারণ স্বরূপ অন্য একটি কথাও বিশেষভাবে মনে রাখা আবশ্যক যে পশ্চিম পাকিস্তানি শোষণকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের পথে পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে সহনীয় করে তুলতে চেয়েছিলেন শাসক সম্প্রদায়। সম্মানজনক শর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির সঙ্গেও বোধহয় সহাবস্থান সম্ভব, এবং তেমন অবস্থায়, একাত্মতা বোধ না করলেও, পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান একটি ঢিলে কনফেডারেশনের অধীনে হয়তো বাস করতে পারতো। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলাকে ব্যবহার করতে শুরু করলো উপনিবেশ হিশেবে। অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে গেলো দেখতে দেখতে। অথচ দেশবিভাগের সময়ে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগ বাস করতেন। * বর্তমানে এ অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬-তে। গণতান্ত্রিক দেশ বলে

* ১৯৫১ সালের সেনসাস অনুসারে পূর্ব বাংলার লোকসংখ্যা ছিলো ৪২,০৬৩,০০০। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৫৫% ভাগ।

পাকিস্তান প্রথম থেকেই দাবি করেছে ; তেমন অবস্থায় পূর্ব বাংলায় উন্নয়ন কার্য বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ ও রাজস্ব ব্যয়িত হওয়া উচিত ছিলো ৫৬ ভাগ। কিন্তু বাস্তবে পশ্চিম পাকিস্তানে—দেশের শতকরা ৪৪ জন লোকের জন্যেই ব্যয়িত হয়েছে দেশের মোট সম্পদের সিংহভাগ। ফলে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিপুল অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অবশ্য আজ পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে দুস্তর অর্থনৈতিক বৈষম্য রচিত হয়েছে তার পেছনে অনেকগুলো ঐতিহাসিক কারণ নিহিত আছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, স্বাধীনতাপূর্বকালে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এক রকমের ছিলো না। বৈষম্যের বীজ তখনই উপ্ত ছিলো। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রে প্রথমে থেকেই পিছিয়ে ছিলেন। সেখানে যে ছোটোখাটো শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ছিলো, তা নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁরা। শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব করতেন হিন্দুরা। যে স্বল্পসংখ্যক মুসলমান শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন, অফিস-আদালতের নিম্নপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা। জমিদার, জোৎদার, আমলা, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি বললে তখন হিন্দুদেরই বোঝাতো।

অপর পক্ষে, পশ্চিম পাকিস্তান-অঞ্চলে এর ঠিক উল্টো অবস্থা দেখতে পাই। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, জমিদার, জোৎদার, আমলা, উকিল, ডাক্তার—সমাজের এ সমস্ত কুলীন পদগুলোর প্রায় সবটাই সেখানে আগে থেকে মুসলমানরা অধিকার করে ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পশ্চিম পাকিস্তানের ল্যাণ্ড রিফর্মস কমিশনের হিশেবে দেখা যায়, জমিদার ও জায়গিরদারপ্রধান এই প্রদেশের ৬,০৬০ জন ভূস্বামী যে পরিমাণ জমির মালিক ছিলেন প্রদেশের ৩৩ লক্ষ কৃষকরা তার থেকে কম জমির মালিক। এঁদের মধ্যে

কারো কারো মোট জমির পরিমাণ ছিলো ১১ লক্ষ একর। এই বৃহৎ ভূস্বামীরা স্বাধীনতারপূর্ব থেকেই জমির মালিক এবং এঁরা মুসলমান। পশ্চিম পাকিস্তান অঞ্চলের ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং আমলারাও ছিলেন অধিকাংশ মুসলমান। এঁদের পক্ষে, স্বাভাবিকভাবেই, ইংরেজি শিক্ষার আধুনিকতম সুযোগ গ্রহণ সম্ভব হয়েছে। দেশবিভাগকালে, এ জন্যে দেখা যায়, পূর্ব বাংলার তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা বেশি ; যদিও পূর্ব বাংলায়, আগেই বলা হয়েছে, শতকরা ৫৫জন লোক বাস করতেন। নিম্নের টেবল থেকে উভয় অঞ্চলের তৎকালীন শিক্ষিতের সংখ্যা বোঝা যাবে ঃ

১৯৫১ সালের গণনা অনুসারে

	মেট্রিকুলেট	গ্রাজুয়েট	পোস্ট-গ্রাজুয়েট
পূর্ব বাংলা	২,৮২,১৫৮	৪১,৪৮৪	৮,১১৭
প. পা.	১,৩৯,৬৯৮	৪৪,৫০৪	১৪,৭২৯

উৎস: Jayanta Ray ; Democracy and Nationalism on Trial ; Simla ; 1968.

প্রারম্ভিক এই সুবিধার জন্যে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সকল উচ্চপদে বসলেন অবাঙালিরা। এবং শুরু থেকেই অসম প্রতিযোগিতার দরুন আজও পূর্ব বাংলা অনেক পিছিয়ে আছে। এখনো পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো দপ্তরের সচিবহিশেবে কোনো বাঙালি নিযুক্ত হননি। অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী কিংবা পরিকল্পনা দপ্তরের অধিকর্তারূপেও কোনো বাঙালি কাজ করেননি। অথচ আমলারাই প্রকৃত পক্ষে সরকারি নীতিনির্ধারণ ও কার্য পরিচালনা করেন ; সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তান অবাঙালি আমলাদের সাহায্যে সংখ্যাহীন অন্যায় সুযোগ নিতে পেরেছে এবং পূর্ব বাংলা, অনুসিদ্ধান্ত হিশেবে, বহু অন্যায় অবিচারের ভাগী হয়েছে।

শিক্ষা ও চাকুরিক্ষেত্রে যেমন পশ্চিম পাকিস্তানের এই প্রারম্ভিক সুযোগ সুবিধা ছিলো, ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রেও তার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। ছোটো, মাঝারি ও বড়ো নিয়ে যে ১,৪১৪ টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান পাকিস্তানের ভাগে পড়েছিলো, তার মধ্যে মাত্র ৩৩৫টি ছিলো পূর্ব বাংলায়। এই ৩৩৫টির মধ্যে আবার ইনজিনিয়ারিং বা কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি জাতীয় কোনো বড়ো শিল্প ছিলো না। অবশ্য এর পেছনেও ঐতিহাসিক কারণ বর্তমান। সাধারণত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে রাজধানী বা কোনো বড়ো শহরকে কেন্দ্র করে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলার রাজধানী ছিলো কলকাতা। তা ছাড়া পূর্ব বাংলায় তখন অবধি কোনো বড়ো শহর নির্মিত হয়নি। যোগাযোগ ব্যবস্থাও বৃহৎ শিল্পের অনুকূল ছিলো না। এমন অবস্থায়, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই, পূর্ব বাংলায় ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কোনো বৃহৎ শিল্প অথবা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়নি। অপর পক্ষে, করাচি ও লাহোর পূর্ব থেকেই রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে তুলনামূলকভাবে রীতিমতো উন্নত নগরী বলে পরিচিত ছিলো। প্রধানত এ দুটি শহরকে কেন্দ্র করেই স্বাধীনতাপূর্বকালে অনেকগুলি শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিলো।

পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের এ সকল পূর্বসৃষ্ট আঞ্চলিক বৈষম্য ছাড়াও, দেশবিভাগের ফলে পশ্চিম পাকিস্তান শুরুতেই উদ্‌বাস্তু আগমনের দ্বারা লাভবান হয়েছিলো। কেননা, আদমজী, ইসপাহানী, দাউদ, সায়গল, হাবিব, দাদা প্রভৃতি পুঁজিপতিরা ভারত ত্যাগ করে পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে বসবাস স্থাপন করেন। বাস্তবিক পক্ষে, দেশবিভাগের সময়ে যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য মুসলিম শিল্পপতি ও পুঁজিপতি ছিলেন ঘটনাক্রমে তাঁরা সবাই ছিলেন অবাঙালি। বসবাস স্থাপনের জন্যেও তাঁরা সাংস্কৃতিক ঐক্যবশত এবং রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সুবিধার দরুন

বেছে নিয়েছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানকে। এঁদের মতো কোনো বড়ো পুঁজিপতি দূরে থাক, মাঝারি শ্রেণীর একজন বাঙালি ধনিকও ভারত থেকে পূর্ব বাংলায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেননি। তদুপরি পূর্ব বাংলার বহু হিন্দু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি বরং দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যান। ফলে নতুন ব্যবসা গড়ে ওঠার পরিবর্তে অনেক পুরোনো প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাও বন্ধ হয়ে যায়।

চাকুরি ও শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে পশ্চিম পাকিস্তান শুরুতেই অনেক অগ্রসর ছিলো। ধনতান্ত্রিক সমাজে এ জাতীয় সুযোগসুবিধা সাধারণভাবে বহুগুণিত হয়। পাকিস্তানের ব্যাপারেও এর কোনো ব্যতিক্রম হয় নি। স্বল্পকালের ভেতর পশ্চিম পাকিস্তান তার যোগ্য আমলা ও রাজনীতিকগণের সহায়তায় একদিকে ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পের প্রভূত উন্নতি করেছে; অন্যদিকে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা সহজেই তাঁদের শিশুদের দিতে পেরেছেন দেশের সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা। ফলস্বরূপ, পূর্ব বাংলা ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পের দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়েছে এবং যোগ্যতর প্রার্থীর সম্মুখীন হয়ে চাকুরিক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানের সমান হতে পারেনি। দেশের সিভিল সার্ভিস, ফরেন সার্ভিস, পুলিশ সার্ভিস, প্রতিরক্ষা বিভাগ, সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হতে থাকলো পশ্চিমাদের দ্বারা। এমন কি, পূর্ব বাংলায় তখন এমন একজন অর্থনীতিবিদ, অথবা রাষ্ট্রতন্ত্রে অভিজ্ঞ আমলা ছিলেন না, যিনি এই ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের কথা অনভিজ্ঞ রাজনীতিকদের বুঝিয়ে বলতে পারেন। রাজনীতিকরা ধরতাই বুলি হিশেবে সভায় সভায় পাটের দাম বাড়ানোর অথবা কনজিউমারস গুড্স্-এর দাম কমানোর দাবি জানাতে থাকলেন; এবং পশ্চিম পাকিস্তান যথারীতি ফেঁপে উঠতে থাকলো।

অথচ ১৯৪৭ সালের পর হিন্দুদের দেশত্যাগের ফলে পূর্ব বাংলার উৎপাদন কর্মে যথার্থ শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিলো। পুঁজি থাকলে

তখন বাঙালি মুসলমানদের পক্ষে সেখানকার ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পকাজে অংশগ্রহণ সম্ভব হতো। কিন্তু এ সুযোগ নিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিরা। এখানে যে স্বল্পসংখ্যক বাণিজ্য ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো, তার মালিক হলেন আদমজী, ইসপাহানী, দাউদ, হাবিব, দাদা, বাওয়ানী, সায়গল প্রভৃতি শিল্পপতিরা। লক্ষণীয় বিষয়, পূর্ব বাংলায় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এঁরা যত নির্মাণ করলেন, পাটকল ব্যতীত অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান তত তৈরি হলো না। পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের জন্যে তাঁরা এই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপন করলেন। আর শিল্পক্ষেত্রে তাঁরা পুঁজি বিনিয়োগ করতে চাইলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। কেননা, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় কারণে তাঁরা এ বিষয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকেই অধিকতর উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচনা করেছিলেন। পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ যদিও বাস করেন অন্য প্রদেশে, তবু করাচি হলো দেশের রাজধানী। সরকারী নীতি প্রভাবিত করা যায় যেখানে থেকে, সেই রাজধানীর চতুর্দিকেই অতঃপর পাকিস্তানের প্রধান শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠলো। ব্যবসা-বাণিজ্যের রাজধানীও হলো পশ্চিম পাকিস্তান। এ ব্যাপারে তখন প্রকারান্তরে পূর্ব বাংলার লোকেরাও সহায়তা করেছেন। মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তখনও তাঁদের মন জুড়ে ছিলো। তাঁরা ভাবতেই পারেননি একই রাষ্ট্রের কোনো একটি অংশে শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রীভূত হলে পরিণামে তাঁরা বঞ্চিত ও শোষিত হতে পারেন।

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় টাকায় টাকা আনে। সুতরাং অল্পকালের মধ্যেই, পশ্চিম পাকিস্তানে, আরো সংক্ষেপে তার একটি বিশেষ অঞ্চলে, এবং আরো সীমিত করে বললে কয়েকজন মানুষের হাতে, জমা হতে থাকলো পুঁজি ও মুনাফার পাহাড় আর সেটা এলো স্বভাবতই দেশের অধিকাংশ মানুষ যেখানে বাস

করে সেখান থেকে। উৎপাদনের ভিত্তি গড়ে উঠলে পরবর্তী পর্যায়ে পুঁজি বিনিয়োগ যেহেতু লাভজনক, সে কারণে পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থেই পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁদের লগ্নীকৃত অর্থের পরিমাণ ক্রমশ বাড়াতে থাকলেন। তাতে কোনো ঝুঁকিও ছিলো না। কিন্তু অনিশ্চিত উৎপাদনের ভিত্তির ওপর পূর্ব বাংলায় পুঁজি বিনিয়োগ ছিলো ঝুঁকির ব্যাপার। এ জন্যে একমাত্র অনিবার্য পাটশিল্প ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার শিল্পবিষয়ে এই পুঁজিপতিরা প্রায় কোনো উৎসাহ দেখাননি।

বলা বাহুল্য, বিনিয়োগের প্রাথমিক বাধা অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব ছিলো। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিক ও পুঁজিপতিরা পূর্ব বাংলার দীন দশা দেখে তাকে আপনাদের সুবিধার জন্যে ব্যবহার করতে চাইলেন। উন্নত হতে না দিয়ে তাঁরা পূর্ব বাংলাকে চিরকালের জন্যে তাঁদের তাঁবেদার করে রাখতে চাইলেন। এই ঔপনিবেশিক মনোভাবের দরুন, অনিবার্য না হলে তাঁরা পূর্ব বাংলায় কোনো পুঁজি বিনিয়োগ করতে চাননি। তাঁরা এই বিষম অবস্থাকে বরং চিরস্থায়ী করার পরিকল্পনা করেছেন।

কিন্তু গণতন্ত্রের ধুয়ো তুললে এই আঞ্চলিক বৈষম্যকে যুক্তিসঙ্গত অথবা ন্যায্য বলে চালানো যায় না। কেননা তখন লোক সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি অথবা রাজস্ব ব্যয় করতে হবে। এ জন্যেই পশ্চিম পাকিস্তানি কায়েমি স্বার্থবাদীরা গণতন্ত্রের পরিবর্তে ঔপনিবেশিক শাসনকে চিরন্তন করতে চেয়েছেন। গণতন্ত্রের বিরোধিতার মূল কথা এই। প্রথম দিকে জিন্নাহ, লিয়াকত আলী অথবা গোলাম মহাম্মদ, এবং পরের দিকে আইয়ুব অথবা ইয়াহিয়া সেই কায়েমি চক্রেরই প্রতিনিধি। সুতরাং এঁরা সকলেই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সকল সময়ে শঙ্কিত ও সতর্ক থেকেছেন। যখনই পূর্ব বাংলায় কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলন (যেমন ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের বিজয়) দানা বেঁধেছে, এই স্বার্থবাদীরা কোনো না

কোনো অজুহাত দেখিয়ে তাকে নস্যাৎ করেছেন।

অথচ পূর্ব বাংলার একমাত্র সম্বল ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সুতরাং বারংবার তাকে গণতন্ত্রের দাবি জানাতে হয়েছে। প্রতিবারেই তার পরাজয় হয়েছে। এবং সেই পরাজয়ই দীর্ঘকাল পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক বিশৃংখলার কারণ।

পশ্চিম পাকিস্তান অবশ্য পূর্ব বাংলার মনোবেদনাকে হ্রাস করতে চেয়েছে ধর্মীয় নেশা ধরিয়ে। ইসলামি সংস্কৃতি নামক একটি কল্পিত জিনিসকে বাস্তবরূপ দিতে কেন্দ্রীয় সরকার অনেক অর্থ ব্যয় ও সাধ্যসাধনা করেছে। তার পেছনে উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, পূর্ব বাংলা ভারত বিদ্বেষ এবং তথাকথিত তামুদ্দনিক জোশবশত পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণকে সহনীয় বলে মনে করবে। তাকে মেনে নেবে বিনা প্রতিবাদে। উর্দু ভাষা বাঙালি ও পশ্চিমাদের মধ্যে এ মিলন ঘটাবে এরূপ ভরসাও ছিলো কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর।

উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রের পেছনে আব একটি গূঢ় উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, একটি বাড়তি ভাষা শেখার গুরুভার সফলতার সঙ্গে বাঙালি শিশুদের ওপব চাপিয়ে দিতে পারলে, ভবিষ্যতে বাঙালিদের মধ্যে থেকে এমন কোনো যথার্থ যোগ্য ও প্রতিভাবান ছাত্র বেরিয়ে আসবে না, যারা উচ্চপদের জন্যে পশ্চিমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে। ফলে ভবিষ্যতে বাঙালিরা আমলাতন্ত্র তথা সরকারী নীতিনির্ধারণযন্ত্র থেকে বঞ্চিত হবে।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক চক্রের হিশেবে ভুল ছিলো। বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণ করতে গিয়ে তাঁরা বাঙালিদের একেবারে মর্মমূলে আঘাত দিয়েছিলেন। ফলে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে বাঙালিরা উর্দুর ষড়যন্ত্র থেকে আত্মরক্ষা করেছিলেন। বাংলা ভাষাকে তাঁরা বাঁচিয়ে রাখলেন। উপরন্তু আনুষঙ্গিকভাবে

তাঁরা সচেতন হলেন তাঁদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও জাতীয়তা সম্পর্কে। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য বিষয়েও তাঁরা ধীরে ধীরে সচেতন হলেন।

তবে বাঙালিদের এ সচেতনতার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানি স্বার্থবাদীদের কায়েমিচক্র ভেঙে যায়নি। তাঁরা অতঃপর আটঘাট বেঁধে, প্রয়োজনমতো, সামরিক শক্তির সহায়তায় তাঁদের ঔপ-নিবেশিক শোষণকে অন্তহীন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এ শোষণ সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যত বৃদ্ধি পেয়েছে, পশ্চিম পাকি-স্তানি ও বাঙালিদের পরস্পর অবিশ্বাস ও বিদ্বেষও ততই বেড়েছে।

স্বাধীনতা লাভের কাল থেকে পূর্ব বাংলার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তার পরিমাণ কত বেশি এবং কত দ্রুত তা বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকটি তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে তা সহজবোধ্য হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

পূর্বেই বলা হয়েছে দেশ বিভাগের সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষিতের হার পূর্ব বাংলার চেয়ে বেশি ছিলো। তদুপরি পশ্চিম পাকিস্তানের জমিদার, জায়গিরদার, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, আমলা প্রভৃতির পক্ষে সন্তানাদির জন্যে যে উন্নত শিক্ষার আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে, পূর্ব বাংলার লোকদের পক্ষে তা ছিলো অসম্ভব। প্রারম্ভিক এ সুবিধা ছাড়াও সরকার পরবর্তীকালে পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষার জন্যে অনেক বেশি ব্যয় করেছেন এবং উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে শিক্ষাখাতে যথাক্রমে মোট ৭৯.৫ ও ১১৪.৩ কোটি টাকা বরাদ্ধ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় পূর্ব বাংলার শিক্ষার জন্যে মোট ১২৩ কোটি টাকা ব্যয়িত হবে বলে স্থির করা হয়। অথচ শেষ পর্যন্ত মাত্র ৪২ কোটি টাকা পূর্ব

বাংলাকে দেওয়া হয়। সামগ্রিকভাবে নতুন ব্যবস্থা অনুসারে পূর্ব বাংলার দরিদ্রদের পক্ষে শিক্ষালাভ করা অসম্ভব না হলেও দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্যে দেখা যায় সময়ের অনুপাতে পূর্ব বাংলায় শিক্ষিতের সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের মতো বাড়েনি। বাস্তবিক পক্ষে, ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালের গণনার তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে পূর্ব বাংলায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষিতের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

	১৯৫১	১৯৬১	বৃদ্ধি বা হ্রাসের হার
		ম্যাট্রিকুলেট	
পূ. বাং.	২,৮২,১৫৮	২,৯৯,৭৬৭	+৬·৩
প. পা.	২,৩৯,৬৯৮	৫,৮৪,১৮১	+১৪৩·৭
		গ্রাজুয়েট	
পূ. বাং.	৪১,৪৮৪	২৮,০৬৯	−৩২·৩৩
প. পা.	৪৪,৫০৭	৫৪,০০০	+২১·৩
		পোস্ট-গ্রাজুয়েট	
পূ. বাং.	৮,১১৭	৭,১৪৬	−১২
প. পা.	১৪,৭২৯	২৪,৩২৪	+৬৮

উৎস: Jayanta Roy

পূর্ব বাংলার স্কুল-কলেজ ও ছাত্র সংখ্যা এবং সরকারি সাহায্যের পরিমাণও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

মাধ্যমিক স্কুল ও ছাত্র সংখ্যা

পূর্ব বাংলা

বছর	মোট উচ্চ বিদ্যালয়	মোট ছাত্র
১৯৪৭-৪৮	৩,৪৮১	৫,২৬,০২০

	১৯৬৯-৭০	৩,৯৬৪	১৪,৪০,০০০
বৃদ্ধির হার	১৯৪৭-৭০	১৪%	১৭৪%

উৎস : Case for Bangla Desh ; C. P. I. Publication ; Delhi ; 1971.

পূর্ব বাংলায় ১৯৪৭ সাল থেকে ২৩ বছরের মধ্যে স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৭% ভাগ, অথচ ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৭৪% ভাগ। কিন্তু সমকালে পশ্চিম পাকিস্তানে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৭১% ভাগ। এ ছাড়া সরকারি স্কুলের সংখ্যা পূর্ব বাংলায় ৯০টি, পশ্চিম পাকিস্তানে ৬৫৩টি। কেবল স্কুলের ক্ষেত্রে নয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষেত্রেও একই জাতীয় বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব বাংলায় মোট কলেজের সংখ্যা ২১৫ (তার মধ্যে ৩১টি সরকারি), পশ্চিম পাকিস্তানে কলেজ আছে মোট ২৭৫টি (সরকারি ১১৪টি)। পূর্ব বাংলায় সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ৪টি, পশ্চিম পাকিস্তানে ৫টি।

বৈজ্ঞানিক গবেষণাক্ষেত্রে বৈষম্য আরো প্রকট। এ বাবদে কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ ব্যয় করেছেন তা থেকে আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে।

বছর		পূ. বাং.	প. পা.	অনুপাত
১৯৫৪		৫	২৫	১ : ৫
১৯৫৫	—	১৩	৪৭	১ : ৩·৬
১৯৫৬	—	৫	১০	১ : ২
১৯৫৭	—	১৭	৮৩	১ : ৫
১৯৫৮	—	২৬	৯০	১ : ৩·৫
১৯৫৯	---	১৮	১০৮	১ : ৬

১৯৬০ ---	১৮	৯৭	১ : ৫.৪
১৯৬১ ---	১৫	৮৫	১ : ৫.৬
১৯৬২ --	৩২	৯৯	১ : ৩
১৯৬৩ ---	৪২	১১৪	১ : ২.৭
মোট ১০ বছর	১৯১	৭৬২	১ : ৪

উৎস : অমিতাভ গুপ্ত, পূর্ব পাকিস্তান, কলকাতা : ১৩৭৬

ব্যয়ের এই বৈষম্য ব্যতীত পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্চ শিক্ষার মান অত্যন্ত নিম্ন বলে সেখানকার ছাত্রদের পাশের হার ও শ্রেণী উভয়ই পূর্ব বাংলা থেকে অনেক উন্নত। চাকুরির ব্যাপারে এজন্যে পশ্চিম পাকিস্তান বহু অন্যায় সুযোগ পেয়ে থাকে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত বৈষম্যের পরিমাণ বোধগম্য হবে :

১৯৬৫ সালের ফলাফল

	ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	করাচি প্রঃ কলেজ
মোট পরীক্ষার্থী	১৪০	১১৭
উত্তীর্ণের সংখ্যা	১০০	১১৭
অনুত্তীর্ণের সংখ্যা	৪০	
প্রথম শ্রেণী প্রাপ্তদের সংখ্যা	১২	১২৬

উৎস : Jayanta Roy

চাকুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য

শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রভূত বৈষম্যের পরোক্ষ ফলস্বরূপ চাকুরির ব্যাপারেও অন্তহীন বৈষম্য জমে উঠেছে। তা ছাড়া, পূর্বেই বলা

হয়েছে, এ বিষয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের একটা প্রারম্ভিক সুবিধা ছিলো। কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরি নয়, পূর্ব বঙ্গীয় সরকারের কুলীন চাকুরিগুলোও প্রায় সবই অবাঙালিদের হাতে। কয়েকটি পরিসংখ্যান থেকে এই মন্তব্যের যথার্থতা স্পষ্ট হবে।

১৯৬৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে যে দু'লক্ষ পদ ছিলো, তার মধ্যে মাত্র ২০,০০০ বাঙালিদের অধিকারে ছিলো। অর্থাৎ মোট চাকুরের শতকরা দশভাগ মাত্র বাঙালি।

উৎস : Jayanta Roy

দপ্তর অনুসারে এই বৈষম্যকে আরো বিস্তৃতভাবে দেখানো যেতে পারে :

	শতকরা হার	
	বাঙালি	পশ্চিম পাকিস্তানি
প্রেসিডেন্টের দপ্তর	১৯	৮১
প্রতিরক্ষা	৮·১	৯১·৯
শিল্প	২৫·৭	৭৪·৩
স্বরাষ্ট্র	২২·৫	৭৭·৫
শিক্ষা	২৭·৩	৭২·৭
তথ্য	২০·১	৭৯·৯
স্বাস্থ্য	১৯	৮১
কৃষি	২১	৭৯
আইন	৩৫	৬৫
পাবলিক সার্ভিস কমিশন	১৩·৫	৮৬·৫

উৎস : Asit Bhattacharyya ; Pakistan Elections, Calcutta, 1970

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পদগুলি পুনরায় নিম্নরূপ বিশ্লিষ্ট করা যেতে পারে

পদ	মোটসংখ্যা	বাঙালি
প্রথম শ্রেণীর অফিসার	২৯	৩
ফাইন্যান্স উইং অফিসার	৩৯	১
ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল এভিয়েশন	১১	১
সাইফার বিভাগ	১০	১
প্রধান প্রশাসনিক অফিসারের দপ্তর	৫৯	০
ইণ্টার সার্ভিস ইনটেলিজেন্স	৩	০
অ্যারোনটিকাল ইনসপেকশন	৫	১
এয়ারপোর্ট ম্যানেজমেণ্ট, করাচি	১	০
সেণ্ট্রাল ইনজিনিয়ারিং ও স্টোরস	৪	৩
সিভিল এভিয়েশন ট্রেনিং	৩	০
মিলিটারি মেডিক্যাল সার্ভিস	৯	১
পি এম এ, কাকুল	৩	০
আর্মি অর্ডন্যান্সকোর্স	১০	২
ইনসপেকশন ও টেকনিক্যাল ডেভেলপমেণ্ট	৮	০
আর্মি স্টোর্স	১০	০
আর্মি ইনসপেকশন ডিপো	১০	০
ইনসপেক্টর অব আরমামেণ্টস	১৩	০
ভেহিক্যাল অ্যাণ্ড ইনজিনিয়ারিং	৩	০
সিগ্নে ল্যাবরেটরি	২	০
ফরমেশন অব নেভি	১৮	১

উৎস : Asit Bhattacharyya.

সৈন্যবিভাগে বাঙালিদের সংখ্যা নিম্নরূপ :

	শতকরা হিশাব
আর্মি	৫
জুনিয়র কমিশনড অফিসার ও অন্য র‍্যাঙ্ক	৭-৮
আর্মি মেডিক্যাল কোর্স	২৩
নেভি	১৯
টেকনিক্যাল অফিসার	৯
চীফ পেটি অফিসার	২১
লীডিং সীম্যান	২৮
বিমান বাহিনী	
জি, ডি, পাইলট	১১
নেভিগেটর্স	৩১
প্রশাসন	২৭
শিক্ষা	১৩
বৈদেশিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসার	
আর্মি	৮
জে, সি, ও	১
নেভি	১০
এয়ার ফোর্স	১২

উৎস : Asit Bhattacharyya.

পরিসংখ্যান অনুসারে দেখা যায় কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকাংশ পদে অধিষ্ঠিত আছেন পশ্চিম পাকিস্তানিরা। এ কথা বিশেষ করে বড়ো পদগুলোর ব্যাপারে আরো বেশি সত্য। সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানিরা শতকরা প্রায় একশটি পদই দখল করে আছেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নের টেবলটি দ্রষ্টব্য

পদের নাম	বাঙালি	পঃ পাকিস্তানি
সেক্রেটারি	০	৪২
জয়েন্ট সেক্রেটারি	৮	২২
ডেপুটি সেক্রেটারি	২৩	৫৯
সেকশন অফিসার	৫০	৩২৫
প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার	৮১১	৩,৭৬৯
দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার	৮৮৪	৪,৮০৫
দ্বিতীয় শ্রেণীব ননগেজেটেড অফিসার	১,১৮০	৫,৫৫১
তৃতীয় শ্রেণীর ননগেজেটেড অফিসার	১৩,৭২৪	১,৩৭,৯৭৫

উৎস : অমিতাভ গুপ্ত

বৈদেশিক সার্ভিসে একই রকমের বৈষম্য লক্ষণীয়।

পদ	বাঙালি	পঃ পাকিস্তানি
রাষ্ট্রদূতসহ প্রথম শ্রেণীর অফিসার	৫৮	১৭৯
দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারী	৪৮	১৯৬

উৎস : ঐ

চাকুরি ও শিক্ষাক্ষেত্রের এই বৈষম্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রকট। কিন্তু দেশের উভয়াংশের মধ্যে যে পর্বতপ্রমাণ অর্থনৈতিক অসাম্য বিদ্যমান তার জন্যে সত্যিকারভাবে দায়ী উন্নয়নকার্যে লগ্নীকৃত

অর্থের বিষম বণ্টন এবং রাজস্বখাতে ব্যয়। আগেই বলা হয়েছে দেশবিভাগের কালে পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপাদনের মোটামুটি একটি ভিত্তি রচিত হয়েছিলো এবং বৃহৎ পুঁজিপতিরা সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানি ছিলেন। দেশের নীতিনির্ধারকযন্ত্রের সহায়তায় বিনা ঝুকিতে অতঃপর বেসরকাবি ও সবকারি উদ্‌যোগে পশ্চিম পাকিস্তানে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উন্নয়নখাতে পু জি বিনিয়োগ হতে থাকে। অপর পক্ষে, পূর্ব বাংলা প্রধানত একদিকে কাঁচামালের জোগান দিতে থাকে, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে তৈরি জিনিস সেখানে মোটা মুনাফায় বিক্রয় হতে থাকে। তুলনামূলকভাবে নগণ্য পু জিই সেখানে বিনিয়োগ করেছেন সরকার অথবা পু্ঁজিপতিরা। তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে উন্নয়নখাতে যে পরিমাণ সরকারি ও বেসরকারি পু জি পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানে লগ্নীকৃত হয়েছে, তা থেকে এক নজরে বৈষম্যের মাত্রা অনুমান করা সম্ভব হয়। নিম্নে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়নখাতে ব্যয় বরাদ্দের একটি টেবল দেওয়া হলো ঃ

উন্নয়নখাতে ব্যয়বরাদ্দ

কোটি টাকার অঙ্কে

	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬০-৬৫)		তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬৫-৬৮)		
	পূঃ বাং	প. পাকি.	কেন্দ্র	পূঃ বাং	পশ্চিম পাকি.
সরকারি সেকটর	৫০১·৭	৫৬৯·২	৩২৪·১	৬৩৭·৭	৫৮৮·৬
বেসরকারি সেকটর	৪০০	৭৫০০	—	২৬৯·৫	৯৫৫·৫

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পূর্ব বাংলার জন্যে বরাদ্দকৃত মোট অর্থের আবার সামান্যই (শতকরা মাত্র ৩৫ ভাগ) প্রকৃত পক্ষে ব্যয়িত হয়েছে।

এ ছাড়া ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানিগুলোর প্রায় সবটার মালিক পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিরা। এগুলোর কেন্দ্রীয় দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত এবং লগ্নীকৃত অর্থেরও প্রায় গোটাটাই সেখানকার ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পে নিয়োজিত। বাস্তবিক পক্ষে, পাকিস্তানের মোট ১৮টি ব্যাঙ্কের মধ্যে দুটির জন্ম পূর্ব বাংলায়। আর ৩৩টি বীমা কোম্পানির ৩টি পূর্ব বঙ্গীয়। এই বীমা কোম্পানি-গুলোর লগ্নীকৃত টাকার পরিমাণ ১৮ কোটি, তার মধ্যে পূর্ব বাংলায় মাত্র ২ কোটি।

উন্নয়নকার্যে পাবলিক ও প্রাইভেট সেকটরে এবং ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানির লগ্নীকৃত অর্থ ছাড়া, রাজস্বের বিষম বণ্টনহেতু পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবধান ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৬০ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার অসংকোচে পূর্ব বাংলার চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে বেশি অর্থ বরাদ্দ করেছেন। তারপর ১৯৬০ সাল নাগাদ পূর্ব বাংলায় ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের মুখে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দেশের উভয়াংশের মধ্যে সংখ্যাসাম্যের নীতি স্বীকৃত হয়। সংখ্যাসাম্য, প্রকৃত পক্ষে, নির্লজ্জ বৈষম্য মাত্র। কেননা এ নিয়ম অনুসারে দেশের শতকরা ৫৬ জন লোককে শতকরা ৪৪ জন লোকের সমান বলে গণ্য করা হয়। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তান যে অন্যায় সুযোগসুবিধা লাভ করেছে এবং পূর্ব বাংলার প্রতি যে অপরিসীম অবিচার করা হয়েছে, বর্তমান নিয়ম অনুসারে তার কোনো প্রতিকার তো হলোই না, উপরন্তু পূর্ব বাংলায় বসবাসকারী দেশের অধিকাংশ লোককে পশ্চিম পকিস্তানে বসবাসকারী কম সংখ্যক লোকের সমান করে অধিকতর শোষণের শিকারে পরিণত করা হলো।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়, পশ্চিমা স্বার্থবাদী গোষ্ঠী নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন। তাঁরা ব্যাহত পূর্ব বাংলার জন্যে পশ্চিম

পাকিস্তানের চেয়ে সামান্য বেশি অর্থ বরাদ্দ করলেন। তারপর মোটা অঙ্কের অর্থ রাখলেন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্যে (যা পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত)। যেমন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারিখাতে বরাদ্দ ছিলো নিম্নরূপ ঃ

পূর্ববাংলা = ৫২৮ কোটি
প. পাকিস্তান = ৫১০ কোটি
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল = ১১১ কোটি

ফলে কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ মাথা পেছু পেলো ১৩৮ টাকা আর পূর্ব বাংলার জনগণ মাথা পেছু পেলো ৯০ টাকা।

অর্থ বরাদ্দে এই বৈষম্য পুনরায় বৃদ্ধি পায় প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের জন্যে। প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মচারীরাও যেমন শতকরা ৯১ জন পশ্চিম পাকিস্তানি, তেমনি প্রতিরক্ষাখাতে বরাদ্দ সবটা অর্থ আবার পশ্চিম পাকিস্তানেই ব্যয়িত হয়। যেহেতু পাকিস্তানের বাৎসরিক স্থায়ী ব্যয়ের প্রায় অর্ধেকই প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয়িত হয়, সুতরাং এই বিপুল অর্থের দ্বারা কেবলমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানই উপকৃত হয়েছে।

এতদ্‌ব্যতীত, কেন্দ্রীয় রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী ব্যয়ের সিংহভাগ স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানি জনগণের প্রত্যক্ষ ব্যবহারে এসেছে। তদুপরি রাজধানীর নাম করে প্রথমত করাচি নগরীর প্রভূত উন্নতি সাধন করা হয়েছে এবং সেখানকার উন্নয়ন কার্য শেষ হওয়ার পর রাজধানী করাচি থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ইসলামাবাদে। নতুন করে ইসলামাবাদ নগরী নির্মাণে ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। করাচি ও ইসলামাবাদের উন্নতির ব্যয়ভারের অধিকাংশ যদিও পূর্ব বাংলা বহন করেছে, তথাপি তার দ্বারা লাভ হয়েছে

একমাত্র পশ্চিম পাকিস্তান।

রাজধানী নির্মাণের মতো পরিকল্পনা বহির্ভূত অনেকগুলো প্রকল্পের জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানে বহু অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। মঙ্গলা বাঁধ, তারবেলা বাঁধ, জমির লবণাক্ততা দূরীকরণ প্রভৃতি প্রকল্পের জন্যে যথাক্রমে ৮৫০ কোটি, ১২০০ কোটি ও ৮০০ কোটি মোট ২৮৫০ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। বলা বাহুল্য এ প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানিরা। এগুলির সঙ্গে তুলিত হতে পারে এমন কোনো প্রকল্প পূর্ব বাংলার জন্যে গ্রহণ করা হয় নি। এমন কি, প্রতি বছর বন্যায় পূর্ব বাংলার প্রভূত ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও, বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্যে ২০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্পও গৃহীত হয়নি। অথবা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস রোধ করার জন্যে একটি যথার্থ উপযোগী উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণের দাবি বহু দিন ধরে করা সত্ত্বেও সরকার এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেননি।

পুঁজি বিনিয়োগ ও উন্নয়ন কার্য ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও পূর্ব বাংলাকে শোষণ করা হয়েছে। পূর্ব বাংলার পাট, চা, চামড়া ইত্যাদি রপ্তানি করে পাকিস্তান প্রথম দিকে তার অধিকাংশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। অথচ আমদানির বেলায় পূর্ব বাংলাকে বঞ্চিত করে লাভবান হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান। নিম্নের টেবল থেকে রপ্তানি ও আমদানির এই হেরফের স্পষ্ট হবে।

হাজার টাকাব অঙ্কে

বছর	পূর্ব বাংলা		প. পাকিস্তান	
	রপ্তানি	আমদানি	রপ্তানি	আমদানি
১৯৪৭-৫২	৪৫,৮১,৫৯৬	২১,২৮,৬২৮	৩৭,৪৫,৯০৬	৪৭,৬৮,৯২৩
১৯৫২-৫৭	৩৮,৬৯,৭৬৬	২১,৫৯,৫৫২	৩৪,৪০.৩৭১	৫১,০৫,০৯৩
১৯৫৭-৬২	৫৫,০৮,৩৫৫	৩৮,৩১,৯২৪	২৭,২৪,১৬৯	৮৫,৫৪,১৭০

১৯৬২-৬৭	৬৯,২২,৬৯০	৭০,৬৩,৬৯২	৫৭,৫৪,৩৬৮	১৫৯,৬০,০২৫
মোট ২০ বছর				
	২০৯,৮২,৩৯১	১৫১,৮৩,৭৯৬	১৫৭,০৪,৭১৪	৩৪৩,৪৪,২১১

উৎস : A Case for Bangla Desh.

পূর্ব বাংলা যদিও ২০৯৮ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করেছে, তবু তাকে আমদানি করতে দেওয়া মাত্র ১৫১৮ কোটি টাকার পণ্য। অপর পক্ষে, পশ্চিম পাকিস্তান ১৫৭০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে আমদানি করেছে ৩৪৩৪ কোটি টাকার পণ্য। এটা সম্ভব হয়েছে পূর্ব বাংলার উপার্জিত ৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আত্মসাৎ করে এবং বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগে আপন কাজে লাগিয়ে। উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক সাহায্যের দৌলতেই পশ্চিম পাকিস্তানে অত উন্নয়ন কার্য করা সম্ভব হয়েছে এবং সেখানকার শিল্পের অত প্রসার ঘটেছে।

আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যেও পূর্ব বাংলাকে ব্যাপকভাবে ঠকানো হয়েছে। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলায় তার চেয়ে ৫৭৯ কোটি টাকার বেশি জিনিস আমদানি করা হয়েছে। এ ভাবে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলার সঙ্গে অসম ব্যবসায় এই বিপুল লাভের ভাগী হয়েছে।

শিক্ষা, চাকুরি, উন্নয়নকার্য, রাজস্ব বণ্টন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বৈদেশিক সাহায্য বিনিয়োগ এবং আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যে ব্যাপক বৈষম্যের দরুন পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থ-নৈতিক অবস্থার এমন বিপুল তারতম্য ঘটেছে। এই বৈষম্যের হার

১৯৫০ সালে ছিলো ১৮%, ১৯৬০ সালে ২৫%, ১৯৬৫ সালে ৩১% এবং ১৯৭০ সালে ৩৮%। বর্তমান মাথাপিছু আয় পূর্ব বাংলায় ৩৫০ টাকার মতো এবং পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় ৬০০ টাকা। বর্তমান ক্রয়ক্ষমতা অনুসারে পূর্ব বাংলার এ আয় নিতান্ত নগণ্য।

প্রকৃত পক্ষে, মাথাপিছু আয় যা-ই হোক না কেন, পূর্ব বাংলার দরিদ্র জনগণের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়েছে। শ্রমিকদের আয় বর্তমানে সেখানে শতকরা ৩০ ভাগ কমে গেছে। মুদ্রা-স্ফীতির জন্যে ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে টাকার মূল্য শতকরা ৪০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। ফলে, ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের ভেতর দরিদ্রদের পক্ষে খাদ্য শস্য ক্রয়ের ক্ষমতা শতকরা ৩'১ ভাগ, তৈল ক্রয়ের ক্ষমতা শতকরা ৩৭'৮ ভাগ এবং বস্ত্র ক্রয়ের ক্ষমতা শতকরা ৩৭'১ ভাগ কমে গেছে। বর্তমানে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা পূর্ব বাংলায় শতকরা ১৭'৪৫ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ৮'০৫ জন। আর ভূমির মালিক এমন কৃষকদের শতকরা ৫২ জন মাত্র ১ থেকে ৭ একর জমির অধিকারী। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, সাধারণ মানুষের দুরবস্থা সময়ের সঙ্গে অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাকিস্তান সৃষ্টির কালে মুসলিম লীগের দাবি ছিলো এদেশ মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে সংরক্ষণ করবে। কিন্তু এই ক্রমবর্ধমান বৈষম্য 'মুসলমানদের প্রতি অর্থ-নৈতিক সুবিচারের' উত্তম প্রমাণ নয়; বরং সকল বাস্তব দিক দিয়ে তা প্রমাণ করে যে, পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ মাত্র। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একটি নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী পূর্ব বাংলায় গড়ে উঠলো বটে, কিন্তু উৎপাদন কর্মে যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সেই কৃষক-শ্রমিকদের অবস্থা ক্রমশ হীন থেকে হীনতর হতে থাকে। ওদিকে গড়ে-উঠতে-থাকা মধ্যবিত্ত শ্রেণী পশ্চিম পাকিস্তানি বিত্তবান ও মধ্যবিত্তদের তুলনায় নিজেদের

অর্থনৈতিক অবস্থার বিপন্নতা ও নির্জীবতা সম্পর্কে সচেতন হতে থাকেন। দেশের সকল কৃষক শ্রমিক এবং নিম্নমধ্যবিত্তরা এই অর্থনৈতিক শোষণের মুখে তথাকথিত রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থহীন বলে জ্ঞান করেছে। ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় এবং ফলত দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের জনগণ এই অর্থহীন স্বাধীনতার প্রতি বিরূপ হয়েছেন। দ্বিজাতিতত্ত্ব তাঁদের কোনো শান্তি অথবা সান্ত্বনা দেয়নি। তারা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন গোরু খাওয়ার স্বাধীনতা থাকলেই, গোমাংস জোটে না। এই সামগ্রিক হতাশা ও বঞ্চনার মুখে ধর্মের মিষ্টি জলে চিঁড়ে ভেজে না। সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ও ভারতবিদ্বেষী প্রচার সত্ত্বেও সাধারণ মানুষেরা পাকিস্তানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করেন এবং পাকিস্তানের ভিত্তির নীচেকার চোরাবালি ধীরে ধীরে সরে যেতে আরম্ভ করে। পাকিস্তানের রসাতল যাত্রা শুরু হলো এ ভাবে।

রাজনৈতিক পটভূমি

১৯৪০ সালে লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো। প্রস্তাবে বলা হয়েছিলো, কয়েকটি স্বশাসিত প্রদেশ নিয়ে একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠন করা হবে যে রাষ্ট্রে মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ পুরোপরি সংরক্ষিত হবে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এ প্রস্তাবে পাঁচটি শর্ত আছে। ক. ইসলামি সংস্কৃতি-চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা, খ. হিন্দুদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে মুসলমানদের জন্যে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠন; গ. এই নতুন রাষ্ট্রের জনগণের জন্যে অর্থনৈতিক সুবিচার সুনিশ্চিতকরণ; ঘ. জনগণের রাজনৈতিক অধিকার দান; ও ঙ. সম্পূর্ণ স্বশাসিত প্রদেশ গঠন।

কিন্তু এই শর্তগুলির প্রথম দুটি স্বীকৃত হলেও, অল্পকালের মধ্যে অন্য তিনটি শর্তকে অস্বীকার করার জন্যে একটি সংঘবদ্ধ ষড়যন্ত্র হয়েছে।

এ কথা সত্য যে, মুসলমানরা তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী ও ইংরেজি-বিদ্যার প্রতি বিমুখতা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করার জন্যেই, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হয়েছে ও সামাজিক প্রতিপত্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যহেতু হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পরবর্তীকালে যে প্রতিযোগিতা চলে তা একান্তভাবেই অসম। ইংরেজরা এই বৈষম্যকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টির কাজে অত্যন্ত চতুর ও সফলভাবে ব্যবহার করেছেন

ফলে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসেই এই সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি খুব জটিল আকার ধারণ করে। হিন্দু জাতীয়তা ও মুসলমানদের পশ্চিমী প্রীতি একই প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের এপিঠ ওপিঠ। শিক্ষা ও সম্পদের সুষম বন্টনের সাহায্যে একটি ভারসাম্য সৃষ্টি করে হয়তো এই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে লড়াই করা যেতো। কিন্তু হিন্দু, মুসলিম কিংবা ইংরেজ এর কোনো শিবির থেকেই সে প্রচেষ্টা চালানো হয়নি। বরং হিন্দু জাতীয়তা ও মুসলিম জাতীয়তা সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে নিতান্ত সত্য বলে মনে হয়েছিলো। বাংলাদেশের মুসলমানরা তখন পাকিস্তানের যে দাবি জানিয়েছিলেন এবং মুসলিম লীগকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছিলেন, তার মধ্যে মিথ্যার কোনো স্থান ছিলো না। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারে প্রত্যাশায়ই তাঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির অধিকারী একটি মধ্যপ্রাচ্যের জাতির সঙ্গে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন ইসলামের নামে তাঁরা সুবিচার ও ন্যায্য অধিকার লাভ করবেন এবং হিন্দুদের প্রত্যক্ষ শোষণ থেকে আত্মরক্ষা করা করতে সমর্থ হবেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরে হিন্দু-মুসলিম বৈষম্য অবশ্য দ্রুত কমে আসে। ১৯৪০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেখানে মাত্র কিঞ্চিদধিক দু হাজার মুসলিম ছাত্রছাত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছিলেন, ১৯৭০ সালে --৩০ বছর পরে -সেখানে এক পূর্ব বাংলা দু থেকেই প্রায লক্ষ মুসলিম ছাত্রছাত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছেন। তা ছাড়া, চাকুরি ও ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে হিন্দু প্রতিযোগীর অভাবে অল্পকালের মধ্যেই মুসলমানদের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি পায় এবং হিন্দুদের প্রতি তাঁদের ঈর্ষা ও বিদ্বেষ মন্দীভূত ও দূরীভূত হয়। শিক্ষিত মুসলমানরা অপেক্ষাকৃত সম্মানজনক সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং তার ফলে হিন্দুদের সঙ্গে তুলনা করে তাঁরা অতীতে যে হীনমন্যতায় ভুগতেন, তা-ও মুছে ফেলতে সক্ষম হন।

বরং ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের মুখে তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলমানদের শাসন ও শোষণের প্রতিই সচেতন ও বিরূপ হয়ে ওঠেন।

ধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চার বিষয়েও হিন্দুদের অনুপস্থিতি মুসলমানদের একটি ঈর্ষামুক্ত উদার ও স্বকীয় দৃষ্টি লাভ করতে সহায়তা করে। বরং পরিবর্তিত পরিবেশে ধর্মের চেয়ে তাঁদের কাছে পার্থিব বিষয়ই বেশি প্রাধান্য লাভ করে। নব্যশিক্ষিত মুসলমানরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তথা বৃহত্তর জগতের সংস্কৃতিচিন্তার সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হয়ে ধর্ম ও সংস্কৃতিসম্পর্কে একটি প্রশস্ত মানসিকতার অধিকারী হন। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অংশ হতে পারলো বলেই, একথা অনস্বীকার্য, সাম্প্রদায়িক চেতনা অল্পকালের মধ্যে কমে গেলো।

অপর পক্ষে, পূব বাংলার জনগণ যখন তথাকথিত একটি স্বাধীন দেশের অধিবাসী হয়েও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন, তখন প্রথমে তাদের বিদ্বেষ এবং পরে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পরিচালিত হলো পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। মুক্তবুদ্ধির আলোকে জনগণ দেখতে পেলেন হিন্দু জমিদার, হিন্দু ডাক্তার, হিন্দু আমলা, হিন্দু উকিল, হিন্দু শিক্ষক, হিন্দু মোড়ল, হিন্দু চাকুরে শোষণ করছেন না, শোষণ করেছন মুসলমানরাই, বিশেষত পশ্চিম পাকিস্তানি ও তাঁদের তল্পিবাহক মুষ্টিমেয় বাঙালি মুসলমান অর্থাৎ শোচনীয় শোষণের মুখে এ বিষয়টি সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হলো যে, শোষকের কোনো জাত নেই।

পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ ও খান সাহেবদের মধ্যে বস্তুত কোনো পার্থক্য সাধারণ মানুষরা দেখতে পেলেন না, গায়ের রং ছাড়া। অবশ্য ধর্মের জিগির তুলে বাংলার জনগণের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখার জন্যে সরকারি প্রচারযন্ত্রগুলি - জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, পাকিস্তান কাউন্সিল, বাংলা অ্যাকাডেমি, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, রেডিও পাকিস্তান, টেলিভিশন সংস্থা, নজরুল অ্যাকাডেমি, ইসলামিক

অ্যাকাডেমি প্রভৃতি—চিরকাল সক্রিয় ছিলো। সংস্কৃতি ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা এবং ভারতীয় বিদ্বেষ ও ভীতি প্রচারের মাধ্যমেই বাঙালিদের মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট করার অপচেষ্টা হয়েছে। পাকিস্তানের ভণ্ড গণতান্ত্রিক সরকার স্বদেশের বারো কোটি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে অস্বীকার করে কাশ্মীরের ৫০ লক্ষ তথাকথিত 'মজলুম জনতার' আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি বারংবার উত্থাপন করেছেন। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলায় জাতীয় ঐক্য ও টেম্পো বজায় রাখার উদ্দেশ্যে প্রতি রাতে নিষ্প্রদীপ মহড়া অনুষ্ঠিত হতো আর কল্পিত ভারতীয় বিমান আক্রমণের ভয় দেখিয়ে সাইরেন বাজানো হতো। তবু যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই দেশের মানুষের কাছে, বিশেষত বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের কাছে এই যুদ্ধের ফাঁকি ধরা পড়ে এবং কাশ্মীরের প্রতি অগণতান্ত্রিক পাকিস্তান সরকারের মিথ্যা সহানুভূতির গূঢ় রহস্য আর গোপন থাকে না। পশ্চিম পাকিস্তানের চতুর শাসকগোষ্ঠী স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে, দেশের ঐক্য ও সংহতির নামে তাঁদের অব্যাহত শোষণ বজায় রাখা সম্ভব তখনই, যখন ধর্মের নেশা জাগিয়ে রেখে প্রচারণার ক্লিন্ন রূপটিকে জনগণের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে পারবেন। এই সাম্প্রদায়িকতার পথ ধরেই ভারতবিদ্বেষ আর কাশ্মীর-প্রীতি জন্ম নেয়। এবং এই সাম্প্রদায়িকতার পথ ধরেই কাশ্মীর সমস্যাকে জটিলতর করে পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব বাংলার মধ্যে কৃত্রিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত সংঘর্ষ এবং তারপর পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক বিপর্যয় এ দেশের মানুষের কাছে এ অপচেষ্টার অসারত্ব বিকট করে তুলে ধরে।

প্রকৃত পক্ষে, ব্যাপক ও দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শোষণ ও রাজনৈতিক দাসত্বের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ ১৯৬৫ সালের পর পূর্ব ও পশ্চিমের একাত্মতা বোধ করা দূরে থাকুক, পার্থক্য দ্রুত বৃদ্ধি

পেতে থাকে। পূর্ব বাংলার সমাজসচেতন মোহমুক্ত মানুষরা দেখলেন, পূর্ব পূর্ব, পশ্চিম পশ্চিম, এদের মিলন কেবল অসম্ভব নয়, অবাঞ্ছিত ও অহিতকর পূর্ব বাংলার পক্ষে। তাঁরা দেখলেন, আলজেরিয়াকে ফ্রান্সের এবং গোয়াকে পর্তুগালের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলা যেমন উদ্ভট, অযৌক্তিক ও অন্যায়, পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ অংশ বলা তেমনি উদ্ভট, অযৌক্তিক ও অন্যায়। ধর্মীয় ঐক্য রাষ্ট্রগঠনের একমাত্র আবশ্যিক শর্ত হলে আফগানিস্তান থেকে মরোক্কো পর্যন্ত একটি রাষ্ট্র হতে পারতো অথবা গোটা য়ুরোপ থাকতে পারতো একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের অধীনে। কিন্তু ইতিহাস সেরূপ অসম্ভবকে স্বীকার করে না। আলজেরিয়া ও গোয়াতে ফরাসি ও পর্তুগীজ কম ছিলেন না এবং উভয় দেশে যথাক্রমে ফরাসি ও পর্তুগীজ ভাষাও দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ছিলো, তথাপি এই কিম্ভূত সম্বন্ধটি চিরস্থায়ী হতে পারেনি। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের যোগসূত্র আরো দুর্বল। সুতরাং তাদের বিচ্ছেদ অনিবার্য। এই অনিবার্যতার পথেই পূর্ব বাংলার সমাজ-অর্থনৈতিক আন্দোলন প্রথম থেকেই পরিচালিত হয়েছে। ইতিহাসের গতি কার সাধ্য রোধ করে!

আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পূর্ব বাংলা থেকে অনেক বেশি উন্নত ও অবস্থাপন্ন। এবং সেখানকার উন্নয়নের জন্যে পূর্ব বাংলাকে মারাত্মক রকম শোষণ করা হয়েছে। বস্তুত পূব বাংলাকে ঠকিয়েই পশ্চিম পাকিস্তান ফেঁপে এবং ফুলে উঠেছে। এই ক্রমবর্ধমান শোষণ চিরন্তন করা সম্ভব ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে। কেননা, গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত হলে পূর্ব বাংলা উন্নয়নকর্মের এবং ব্যয়িত রাজস্বের অধিকাংশ দাবি করে বসবে। প্রকৃত পক্ষে, পূর্ব বাংলার যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যতীত অন্য কোনো কার্যকর অস্ত্র অথবা মূল্যবান সম্পদ নেই, সে কারণে গণতান্ত্রিক দাবি পূর্ব বাংলার কার্যত বাঁচার

দাবি আর তাকে স্বীকার করার মানেই হলো পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতি ও সামন্তদের একচেটিয়া সীমাহীন লাভ ও লোভের অবসান। যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা রীতিমতো দৃঢ়মূল, তা কখনো এরূপ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে মেনে নিতে পারে না। পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতি ও সামগ্রিকভাবে কায়েমি স্বার্থবাদীরা এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আপনাদের স্বার্থের খাতিরেই প্রথম থেকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে চেয়েছে। কখনো আমলাদের চক্রান্তে, কখনো রাজনীতিকদেব ষড়যন্ত্রে পূব বাংলার দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু ১৯৫৮ সালে অথবা ১৯৬৯ সালে যখন রাজনীতিক ও আমলাবা ব্যর্থ হয়েছেন, তখন সেই কায়েমি স্বার্থবাদীদের রক্ষায় এগিয়ে এসেছে সৈন্যবাহিনী। কেননা সৈন্যবাহিনীও পশ্চিম পাকিস্তানেব শাসকচক্রের সৃষ্ট এবং একই স্বার্থের নিবিড় বন্ধনে তাঁরা আবদ্ধ।

পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলার প্রতি কী রূপ আচরণ ও বিচার করতে চায়, রাষ্ট্র ভাষাব প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তা বাঙালিদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্যাপক গণবিক্ষোভের মুখে তখনকার মতো রাষ্ট্রভাষার দাবি গ্রাহ্য হলেও, পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক অধিকাবকে স্বীকাব করে নেয়নি। বরং ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগকে ধুয়ে মুছে বাঙালিরা আপনাদের দলকে নির্বাচিত করলে, শঙ্কিত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান শাসকচক্র এই নির্বাচিত জনগণের সবকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিতান্ত অন্যায় অজুহাত দেখিয়ে। কেন্দ্রীয় সরকার নানা ষড়যন্ত্রের দ্বারা যুক্তফ্রণ্টকে ভেঙে দিয়ে পরবর্তী কালে আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক দলকে ক্রীড়নকের মতো আপনাদের স্বার্থে ও কাজে ব্যবহার করে। অত্যন্ত হীন ও জটিল রাজনৈতিক আবর্তের সৃষ্টি করে পশ্চিমী কায়েমি স্বার্থচক্র দেখাতে চেষ্টা করেন, দেশে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। কৃত্রিম গোলযোগ ও অরাজকতার মধ্যে ১৯৫৮ সালে সামরিকশাসন জারি

করে এক দশকেরও বেশি সময়ের জন্যে গণতন্ত্রের বিকাশকে অবরুদ্ধ করা হয়। কিন্তু তার পূর্বে, পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিদেরই বিভক্ত করে, ১৯৫৬ সালে যে শাসনতন্ত্র গঠন করা হয়, তাতে পূর্ব বাংলার জনগণের অর্থাৎ পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার অথবা স্বায়ত্তশাসনের দাবি স্বীকার করা হয়নি। মন্ত্রীত্বের টোপ গিলিয়ে কখনো ফজলুল হককে দিয়ে, কখনো সোহরাওয়ার্দিকে দিয়ে আপনাদের স্বার্থবিরোধী এই সংবিধানকে মেনে নিতে বাধ্য করেন কেন্দ্রীয় শাসকচক্র।

আইয়ুব খাঁর আমলে সরাসরি শুধু গণতন্ত্র নয়, সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ হয়। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলিও হলো নিষিদ্ধ। আর প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিকদের বাধ্য করা হলো রাজনীতি থেকে অবসর নিতে। পোডো ও এবডো নামক দুটি কুখ্যাত আইন তৈরি হলো এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে। আইয়ুব চেয়েছিলেন রাজনীতিবর্জিত রাষ্ট্রনীতি। তাঁর আদর্শ ছিলো একটি শক্ত প্রশাসনযন্ত্র সৃষ্টি করে তার দ্বারা দেশকে শাসন ও শোষণ করা। যাতে সেই যন্ত্রের সহায়তায় বৃহৎ পুঁজিপতিরা বিনা সমালোচনায়, বিনা গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় অথবা বিনা রাজনৈতিক বিরোধিতায় চরম উন্নতি করতে পারে। পূর্ব বাংলার ক্রমবর্ধমান স্বশাসন এবং উন্নয়ন ও উৎপাদন কর্মে সমানাধিকারের দাবি যাতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, কায়েমি স্বার্থবাদীদের প্রতিনিধি আইয়ুবের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো তা-ই।

কিন্তু জনগণ ধীরে ধীরে সামরিক শাসনের রক্তচক্ষুকেও অগ্রাহ্য করতে শুরু করেন। ফলস্বরূপ গণতন্ত্রের আন্দোলন আবার দানা বাঁধতে থাকে। ষাট দশকের শুরু থেকেই, বিশেষত পূর্ব বাংলায়, আইয়ুবের বিরুদ্ধে রীতিমতো গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই বিক্ষোভের মুখে আইয়ুব তাঁর রাজনীতিবিহীন রাষ্ট্রপরিচালনার নীতির অসারত্ব সম্বন্ধে সচেতন হন। এবং জনমতকে প্রশমিত

করার জন্যে তিনি একটি স্বরচিত সংবিধান পাকিস্তানিদের হাতে তুলে দেন। সেই সঙ্গে একটি নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়। মজার ব্যাপার হলো, নির্বাচনের পরে আইয়ুব রাজনৈতিক দলগুলিকে বৈধ ঘোষণা করলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিলো, পাছে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে তাঁর নিরঙ্কুশ বিজয়কে ব্যাহত করে। বুনিয়াদি গণতন্ত্রের সর্বগ্রাসী জাল ফেলেও আইয়ুব নিশ্চিন্ত অথবা নিশ্চিত হতে পারছিলেন না, শিকার শেষ পর্যন্ত হাতে আসবে কিনা।

রাজনৈতিক দলগুলি বৈধ বলে ঘোষণা করার অন্য কারণও ছিলো। আইয়ুব বুঝেছিলেন জনগণকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দীর্ঘকাল রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই তিনি নিজে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। তিনি পুরোনো মৃত মুসলিম লীগকেই পুনরুজ্জীবিত করলেন ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। মুসলিম লীগ রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হবে, অথচ অন্য দল চুপ করে থাকবে, এটা অসঙ্গত ও দৃষ্টিকটু বলেই আইয়ুব রাজনৈতিক দলগুলির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিলেন। অবশ্য তার নিশ্চয় ভরসা ছিলো যে, রাজনৈতিক দলগুলি যতই জনপ্রিয় হোক না কেন, বুনিয়াদি গণতন্ত্রের জাল কেটে কেউ বাইরে আসতে পারবে না। তবু নিরাপত্তা হিশেবে গ্রহণ করেছিলেন কয়েকটি ব্যবস্থা। তার মধ্যে ব্যাপক প্রচার একটি। রেডিও এবং টেলিভিশন তাঁর পুরো দখলে ছিলো, তৎসত্ত্বেও বিরোধী সংবাদপত্র-গুলির প্রচারকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে তিনি প্রেসট্রাস্টের জন্ম দিয়েছিলেন। এ ছাড়া পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক বৈষম্যের জনপ্রিয় স্লোগানকে চাপা দেওয়ার জন্যে সংখ্যাসাম্য নামক ধাপ্পা অবলম্বন করেছিলেন। ধাপ্পা, কেননা সংখ্যাসাম্য পূর্বে কৃত বৈষম্যকে দূর করবে না, উপরন্তু ভবিষ্যতে বৈষম্যকে আরো বাড়াবে। কিন্তু ৫৬=৪৪, এই হিশেব দেখিয়েই তিনি জনগণকে ধোঁকা দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

রাজনীতিবর্জিত রাষ্ট্রনীতিতে পবিবর্তন আনার পেছনে আইয়ুবের অন্য একটি উদ্দেশ্য ছিলো। তিনি জানতেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একজন সামবিক একনায়কেব চেয়ে একজন গণতান্ত্রিক প্রেসিডেণ্টের মর্যাদা ও কৌলীন্য বেশি। এই মর্যাদা ও কৌলীন্যের লোভে অতঃপর আইয়ুব খান পাকিস্তানে এমন একটা রাজনৈতিক কাঠামো দাঁড় কবালেন যা নামে গণতন্ত্র কিন্তু কার্যত গণবিরোধী একটি ষড়যন্ত্র। পাকিস্তানেব শতকবা ৯০ জন লোক বাস করেন গ্রামে। এবং গ্রামে শিক্ষিতের সংখ্যাও অত্যন্ত নগণ্য। বাস্তবিক পক্ষে, স্কুল শিক্ষকদেব বাদ দিলে গ্রামে শিক্ষিত লোক প্রায় থাকেন না। এ হেন অবস্থায় অধিকাংশ নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের অর্থনৈতিক, পাবিবাবিক ও সামাজিক পটভূমি কেমন হতে পাবে আইয়ুব তা অনুমান করতে পেরেছিলেন সহজেই। এই গণতন্ত্রীদেব ওয়ার্কস-প্রোগ্রামেব ঘুষ দিয়ে স্থায়ীভাবে কিনে নেওয়া সম্ভব হবে, এ-ও আইয়ুব বুঝেছিলেন ভালো কবে। এ রূপ ৮০,০০০ গণতন্ত্রীর সমর্থন তিনি অনাগতকাল ধরে পেতে থাকবেন, যুক্তিযুক্তভাবে এমন ভরসা তাঁর ছিলো। তাই বুনিয়াদি গণতন্ত্রেব ধোকা দিয়ে তিনি পৃথিবাব প্রশংসা ও স্বাকৃতি লাভ করতে চেয়েছিলেন। তাঁব এ পরিকল্পনা যে অনেকাংশে সফল হয়েছিলো, তার প্রমাণ এই যে বিদেশেব বহু পণ্ডিতজনও বুনিয়াদি গণতন্ত্র নামক কিম্ভূত জিনিশটির স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি করতে না পেরে, এ পদ্ধতির প্রশংসা করেছেন।

কিন্তু এ কথা স্মরণ বাখা আবশ্যক যে, গণতান্ত্রিক শক্তিকে অবদমন করতেই পাকিস্তানেব রাজনীতিক্ষেত্রে আইয়ুবের আগমন। দেশে কোনো প্রকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যাতে বিকাশ লাভ না করে, পশ্চিম পাকিস্তানি কায়েমি স্বার্থবাদীদের দালাল হিশেবে আইয়ুব তা-ই নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। মৌলিক গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রের একটা খোলস খাড়া করে, সত্যিকার গণতান্ত্রিক

আন্দোলনকে চিরদিনের জন্যে চাপা দিয়ে রাখার প্রযত্ন ছিলো আইয়ুবের। বলা যেতে পারে, ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৪ এই সাত বছর তিনি বেশ সাফল্যের সঙ্গে তাঁর কাজ সম্পন্নও করেছিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় জনগণ ততদিনে দেখতে শিখেছেন; আইয়ুবের ধাপ্পাবাজি তাই দীর্ঘকাল তাঁদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখতে সমর্থ হয়নি। ১৯৬৫ সালের নির্বাচনের ফলাফলই এ কথা প্রমাণ করে। ওয়ার্কস, প্রোগ্রাম বাবদ ঘুষ-খাওয়ানো পূর্ব বাংলার ৪০,০০০ বুনিয়াদি গণতন্ত্রীরাও সবাই তাঁকে সমর্থন করেন নি। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে তিনি পরাস্ত হন আর সমগ্র পূর্ব বাংলায়ও তিনি ফাতেমা জিন্নাহর চেয়ে মাত্র ২,৫৭৮টি ভোট বেশি লাভ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানেও করাচিতে তিনি পরাস্ত হন।

পূর্ব বাংলার তৎকালীন অসন্তোষকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্যে নির্বাচনের পরে আইয়ুব সাম্প্রদায়িক ও ভারতবিরোধী কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালের জুন-জুলাই মাসে আইয়ুবের লোক-দেখানো জাতীয় পরিষদ * যখন পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য নিয়ে উত্তেজনাকর আলোচনায় মুখর, তখন জনগণের মনোযোগ বিভ্রান্ত করার জন্যে সরকারি মন্ত্রীরা ও পত্রিকাগুলি ভারতের কল্পিত যুদ্ধংদেহি নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু অবস্থা তাতেও আয়ত্তাধীন হলো না বলে, কাশ্মীরে সুপরিকল্পিত উপায়ে যুদ্ধ বাঁধানো হলো। এই যুদ্ধ পূর্ব বাংলার জনগণের কোনোরূপ উপকার করেনি, বরং যুদ্ধের শেষে তাঁদের দীন অর্থনৈতিক দশা,

---

* আইয়ুবসৃষ্ট জাতীয় পরিষদ কার্যত ক্ষমতাবিহীন ছিলো; কেননা জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত প্রেসিডেণ্ট মেনে নিতে বাধ্যে নন, অথবা প্রেসিডেণ্ট জাতীয় পরিষদের কাছে কোনো ব্যাপারে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নন। প্রাদেশিক গভর্ণরদ্বয় প্রাদেশিক পরিষদের নিকট নন, বরং প্রেসিডেণ্টের নিকট দায়ী তাঁদের কার্যকলাপের জন্যে; আর প্রেসিডেণ্ট দায়ী একমাত্র আপনার কাছে।

আরো দীন হয়েছে। প্রতিষ্ঠাকামী আইয়ুবের হঠকারিতার ফল ভোগ করলেন জনগণ প্রাত্যহিক জীবনে। তদুপরি যুদ্ধের নামে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সংকুচিত করা হয়।

পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি

কিন্তু জরুরি অবস্থা রাজনৈতিক কার্যকলাপ স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে পারেনি। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে সেখানে রাজনীতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এবং এই গুরুত্বপূর্ণ দাবিকে নিয়ে আওয়ামি লীগ পূর্ব বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে। ১৯৫৭ সালে সোহরাওয়ার্দি মন্ত্রীসভার পতনের আট বছর পরে ১৯৬৬ সালে আওয়ামি লীগ পুনরায় সজীব ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ সময়ে পূর্ব বাংলার প্রায় সবগুলি দলই স্বায়ত্তশাসনের দাবি করে আসছিলো। কিন্তু আওয়ামি লীগের মতো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সুস্পষ্ট শর্তে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অন্য কোনো দল চায়নি। ১৯৬৬ সালের শুরুতে শেখ মুজিবুর রহমান যে ছ-দফা দাবি জানান, তা সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত। এ দাবি মেনে নিলে পূর্ব বাংলা ভবিষ্যতে পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিদের দ্বারা আর শোষিত হতো না, এ প্রায় নিশ্চিত-ভাবে বলা চলে; কেননা শোষণের যাবতীয় পথ এ দাবিগুলির দ্বারা রুদ্ধ করা হয়েছিলো। জনগণের প্রবল দাবির মুখে, তখন স্বশাসনের দাবি কমবেশি সকল দলই অবশ্য মেনে নিয়েছিলো। কিন্তু কোনো দলই আওয়ামি লীগের মতো স্পষ্ট করে স্বশাসনের কথা বলতে পারেনি। বরং কোনো কোনো দল প্রকারান্তরে স্বশাসনের দাবিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ভাসানী-পন্থী ন্যাপ অথবা নুরুল আমীন-হামিদুল হক চৌধুরীর পি. ডি. পি মুখে স্বায়ত্ত-শাসনের কথা বললেও, আসলে পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বাধিকার সমর্থন

করেনি। কারণস্বরূপ বলা যায়, ভাসানী নিজের দলকে জনগণের সংস্পর্শে রাখার জন্যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানালেন, তথাপি ছ-দফাকে স্বাগত জানালেন না। সকল বাস্তব দিক দিয়ে ছ-দফা স্বায়ত্ত-শাসনের চরম দাবি, তাকে সমর্থন না জানিয়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে মেনে নেওয়া চলে না। পি. ডি. পি-ও একই মুখে স্বায়ত্ত-শাসন ও শক্তিশালী কেন্দ্রের কথা বলেছে; অথচ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই দাবি দুটি পরস্পরবিরোধী। প্রকৃত পক্ষে, জন-গণের স্বশাসন তথা গণতান্ত্রিক অধিকার এবং শক্তিশালী কেন্দ্র একই সঙ্গে সম্ভব নয়, বিশেষত পাকিস্তানের মতো একটি আজব দেশে, যেখানে গণতন্ত্রের নাম করে দেশের অধিকাংশ মানুষকে ঔপনিবেশিক শোষণের ভুক্তভোগী করা হয়। অথবা দেশের দুই অংশ পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন।

আইয়ুব ছ-দফা দাবির যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি জানতেন ছ-দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র পূর্ব বাংলার প্রতি ঔপ-নিবেশিক শাসনের অবসান ঘটাবে অর্থাৎ তিনি পশ্চিমী যে কায়েমি স্বার্থবাদীদের প্রতিনিধি সেই গোষ্ঠীর অন্তহীন স্বার্থে আঘাত লাগবে। এই জন্যে আতঙ্কিত হয়ে সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করলেন ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে। কিন্তু আওয়ামি লীগের সংগ্রাম এ গ্রেফতার সত্ত্বেও বন্ধ হয়নি। ৭ই জুন দেশব্যাপী হরতাল পালনের আহ্বান জানালেন আওয়ামি লীগ। বহু সংখ্যক আওয়ামি লীগকর্মীকে গ্রেফতার করেও এই হরতালের সফলতা রোধ করা যায় নি। প্রবল আন্দোলন ও বিক্ষোভের মুখে আইয়ুব মোনেমের সরকার প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো। এ সময়ে একাধিক বিদেশী পর্যবেক্ষক বললেন, পূর্ব বাংলার ও পশ্চিম পাকি-স্তানের মিলন ঘটেছে অসাম্যের ওপর ভিত্তি করে; আজ হোক কাল হোক এ বিবাহ বিচ্ছেদ হবেই। সরকার বাস্তব অবস্থার খবর সম্ভবত রাখতেন না; তাই চেয়েছিলেন আওয়ামি লীগের

ছোটো-বড়ো সকল নেতাকে বন্দী করে এ আন্দোলন দমন করতে। এমন কি, ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেনও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। আর নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করলেন সরকার, ফলে ইত্তেফাক গোষ্ঠীয় পত্রিকাগুলির প্রকাশনা বন্ধ হলো। কিন্তু যে দাবি আপামর সকল মানুষের, নেতাদের বন্দী করে তাকে চাপা দেওয়া যায় না। সুতরাং পূর্ব বাংলা ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে স্বশাসনের পথে এগিয়ে চলে।

১৯৬৮ সালের জানুআরি মাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র নামক একটি মামলা দায়ের করে সরকাব আসলে পূর্ব বাংলায় জনমতকে আরো সংগঠিত করেন। সরকাব অভিযোগ করেন শেখ মুজিবুর রহমান কতিপয় উচ্চপদস্থ সরকারি ও সামরিক কর্মচারীদের নিয়ে ষড়যন্ত্র করছিলেন একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের। সত্যি সত্যি এমন কোনো ষড়যন্ত্র হয়েছিলো কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর, কিন্তু ১৯৬৮-৬৯ সালে মামলা চলতে থাকা কালে বাঙালিরা পত্র-পত্রিকা, বেতার ও টেলিভিশনের মারফত জানতে পারলেন পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তান কত অন্যায় অবিচার ও কী বিপুল পরিমাণ শোষণ করেছে এবং সেই শোষণকে চিরস্থায়ী করার ষড়যন্ত্র কত গভীর। পত্রপত্রিকার অব্যাহত প্রচারের ফলে সকল মানুষের মনে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ ও বিক্ষোভ জন্ম নেয় এবং বাংলার স্বাধীনতার আবশ্যিকতা বিষয়ে তাঁরা দ্বিধা-মুক্ত হন। এই মামলা করা হয়েছিলো পূর্ব বাংলার স্বশাসনের দাবিকে অবদমিত করার নিমিত্ত, কিন্তু ফল হয়েছে অভিপ্রায়ের বিপরীত। এই মামলাকে কেন্দ্র করে স্বাধীন বাংলার দাবি দৃঢ়মূলের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৬৮ সালে শেষ দিকে সরকার যখন ষড়যন্ত্রকারীদের সমুচিত শাস্তি দেবেন বলে বগল বাজাচ্ছেন এবং সরকারের দালালরা যখন সামরিক শাসনের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে উজ্জ্বল দশক পালনে

ব্যস্ত, তখন দেশের ছাত্র জনতার ভেতর ধীরে ধীরে প্রবল অসন্তোষ ও তীব্র বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠছিলো। প্রধানত ঢাকা বিশ্ব-বিত্যালয়ের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে এ আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। যে এগারো দফা দাবির ভিত্তিতে এই আন্দোলন গড়ে ওঠে তা আসলে ছ-দফা দাবিরই নামান্তর। এই আন্দোলন দমন করার জন্যে মোনেম খাঁর পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী যতই এলোপাথাড়ি গুলি-বেয়নেট চালাতে থাকে এ বিক্ষোভ ততই জোরদার হতে থাকে। জানুআরি মাসে ছাত্রনেতা আসাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হলে গোটা আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। ছাত্র, শ্রমিক, জনতা কি ভাবে সকল নির্যাতনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে জেগে উঠেছিল তার প্রমাণ পাই মর্নিং নিউজ অফিস পোড়ানোর ঘটনায়। ৫ লক্ষ বিক্ষুব্ধ মানুষের একটি জনতা উদ্যত রাইফেল ও স্টেনগানকে অবজ্ঞা করে আইয়ুবের শখের প্রেসট্রাস্ট অফিসটি পুড়িয়ে দেয়। ১৮ই ফেবরুআরি সৈন্যদের গুলিতে রাজশাহি বিশ্ববিত্যালয়ের রীডার ডক্টর মোহাম্মদ শামসুজ্জোহার মৃত্যুতে সেদিন রাতে কারফিউ অমান্য করে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঢাকার রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। তার ফলে সৈন্যদের অজস্র গুলিতে নিহত হয়েছিলেন অনেক মানুষ, কিন্তু জনতার প্রাণের বন্যা রোধ করা কারো সাধ্যে কুলোয়নি। ঢাকার এই প্রচণ্ড গণ-অভ্যুত্থান দেখে একজন বিদেশী পর্যবেক্ষক বলেছিলেন, ঢাকার গণবিক্ষোভের সামনে বায়াফ্রা ছেলেখেলা মাত্র। বস্তুত এই প্রচণ্ডতার মুখে সরকার বাধ্য হলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা উঠিয়ে নিতে এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য বন্দীদের ছেড়ে দিতে। 'দেশদ্রোহী' মুজিব নিমন্ত্রিত হলেন আইয়ুবের ভরাডুবি বাঁচানোর জন্যে আহূত গোল টেবিল বৈঠকে। ষড়যন্ত্র শেখ মুজিবের, না সরকারের তা স্পষ্ট হলো সাধারণ মানুষের কাছে।

গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলো, পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক দাবি

এবারেও পশ্চিমী শাসকচক্র মেনে নিতে পারলেন না। কিন্তু বিক্ষোভ ও অরাজকতার মধ্যে পূর্ব বাংলা পাছে ক্ষমতা দখল করে ফেলে এই ভয়ে কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী আমলা ও রাজনীতিকদের পবাজয় দেখে সৈন্যবাহিনীকে কাজে লাগালেন। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করলেন, দ্বিতীয়বার পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হলো।

ইয়াহিয়া খান অবশ্য আইয়ুবেব মতো দোর্দণ্ড প্রতাপে হাল ধরতে পারলেন না। কেননা জনমত ততদিনে গণতন্ত্রের প্রতি অনেক বেশি সচেতন হয়েছে। তাই শুরুতেই ইয়াহিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন শীঘ্রই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তিনি সহায়তা করবেন। পূর্ব বাংলার ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিকদের সংগে আলাপ-আলোচনা করে তিনি তিনটি বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিতে পাবলেন। ১. পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ এক ইউনিট প্রথা চায় না: ১. পূর্ব বাংলার প্রতি অত্যন্ত বেশি অবিচাব করা হয়েছে: ও ৩. নির্বাচন জনসংখ্যা ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালের জুলাই মাস থেকে এক ইউনিট প্রথা করা হলো। এবং ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে একটি আদেশ বলে ইয়াহিয়া সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করলেন। জনসংখ্যাব ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে পূর্ববাংলাব জন্য নির্ধারিত হলো ১৬৯টি আসন। এইটুকু গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি ছাড়া Legal framework order-এর বাকি সব কিছুই ছিল অগণ-তান্ত্রিক। ইয়াহিয়া বললেন, জাতীয় সংবিধানসভা নির্বাচিত হবে জনগণের দ্বারা অথচ সে সভা সার্বভৌম হবে না। নিবাচিত জন-প্রতিনিধিরা যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন তা গৃহীত হবে কিনা সেটা নির্ভর করবে প্রেসিডেন্টের খাম-খেয়ালির ওপর। কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধিরা প্রেসিডেন্টের এই অগণতান্ত্রিক দাবি মেনে নেবেন এমন প্রত্যাশা করা অনুচিত। অথচ কায়েমি শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ

রক্ষা না হলে সামরিক জন্টা ক্ষমতা জনগণের কাছে হস্তান্তর করবেন কেন? গণতন্ত্রের নামে, এই কারণে, সামরিক কর্তৃপক্ষ আসলে স্বৈরাচার খাটাতে চেষ্টা করেছেন।

লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার-এর অন্তর্নিহিত অসংগতির মধ্যেই ভাবী গোলযোগ লুক্কায়িত ছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামি লীগ এমন বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে সংবিধান সভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না কবলে বোধ হয় সংবিধান সভা বসাব আগেই গোলযোগ এমন প্রকট হয়ে দেখা দিত না। পশ্চিমী শাসকগোষ্ঠী স্বপ্নেও ভাবেনি পূর্ব বাংলার একটি দল সংবিধান সভায় নিবঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে সমর্থ হবে। ভাবলে পূর্ব বাংলাকে জন সংখ্যার ভিত্তিতে ১৬৯টি আসন কখনই দেওযা হতো না; হয়তো আদৌ নির্বাচনের প্রহসন অনুষ্ঠিত হতো না।

কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ সাড়ে সাত কোটি বাঙালিরা যখন একযোগে বঙ্গবন্ধুকে আহ্বান কবলেন অন্তহীন শোষণ থেকে তাঁদের বাঁচানোর জন্যে, তখনই পশ্চিমী কায়েমি স্বার্থবাদীদের গোটা স্ট্র্যাটিজি বদল করতে হলো। পবিষদেব বাইরেই সংবিধান গঠন করাব চেষ্টা করলেন তাঁরা। এব ফল স্বরূপ পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক দাবি ও পশ্চিম পাকিস্তানের চিরস্থায়ী ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী সংঘাত অনেক আগে পরিষদের বাইরেই নিদারুণ আকারে দেখা দিলো। পরিষদের অধিবেশন মুলতবি বাখা, বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ, ভূট্টো-ইয়াহিয়ার ভণ্ড আলোচনা এবং অভূতপূর্ব গণহত্যা -এর সবই অতঃপর অনিবার্যরূপে রুটিনমাফিক ঘটেছে। ১৯৬৯ সালেই পিটাব হ্যাজেল হার্স্ট, লণ্ডন টাইমস পত্রিকার সাংবাদিক, অনুমান করেছিলেন কায়েমি শোষকচক্রের সঙ্গে স্বাধিকারকামী বাঙালি-দের সংগ্রামের পরিণতিস্বরূপ পূর্ব বাংলায় একদিন ভিয়েতনাম-বায়াফ্রা জাতীয় লড়াই অবশ্যম্ভাবী। ১৯৭০ সালের অগস্ট মাসে

অসিত ভট্টাচার্যও (Pakistan Elections) যথার্থই বুঝেছিলেন লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার-এর ভেতরেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সংঘাত অনিবার্য। সেই অনিবার্যতার বিষফলই এখন সংখ্যাহীন ভাবে ফলছে পূর্ব বাংলায়।

সংযোজন

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন

মাত্র চব্বিশ বছর আগে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের আত্যন্তিক উৎসাহে মুসলিম লীগকে ভোট দিয়ে পাকিস্তান গড়ে ছিলেন, তারাই এমন ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়েছেন, একথা এখন প্রায়শ শোনা যায়। কিন্তু কী করে ক্ষুদ্রতার বন্ধন কেটে চিত্তের এই জাগরণ সম্ভব হলো, সে রহস্য কৌতূহল জাগালেও অজানা সাধারণ মানুষের কাছে। অনেকে এমন মনে করেন যে পূর্ব বাংলার সমাজ-অর্থনীতির ক্ষেত্রে নির্লজ্জ ও উদ্ধত পশ্চিমী আক্রমণের মুখে রাতারাতি এ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সন্দেহের কারণ নেই, সে হামলা পূর্ব বাংলার সুপ্ত চিত্তকে স্বল্প সময়ে জাগ্রত করেছে এবং আকস্মিক এক প্রচণ্ড আঘাতের ফলশ্রুতিস্বরূপ তার ধর্মীয় মোহ চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক ঔদার্যের বীজ উপ্ত না থাকলে, সহসা তাকে অঙ্কুরিত কিংবা পল্লবিত করা যেতো না। ধর্মবিমুক্ত প্রশস্ত দৃষ্টিলাভের সাধনা পূর্ব বাংলার অন্তত অর্ধ-শতাব্দীর। বিপ্রতীপ সমাজ-অর্থনীতির গণ্ডিতে স্বাধীনতা-পূর্ব কালে সে সাধনায় বাঙালি মুসলিম সমাজ সিদ্ধি লাভ করতে পারেনি। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর কালে যুগপৎ পশ্চিমী মুসলমানদের শোষণ এবং হিন্দুদের প্রতিযোগিতার অভাবে শিক্ষাসম্প্রসারণ ও বর্ধিত অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অনুকূল প্রতিবেশে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে, দীর্ঘদিন-পোষিত ভেদবুদ্ধির অন্ধকার দ্রুত দূর করে তার পক্ষে হৃদয় ও বোধের মহত্ত্ব লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষ দিকেই ঢাকার কিছু সংখ্যক মুসলমান শিক্ষক ও ছাত্র সাম্প্রদায়িক হীনমন্যতা বিসর্জন দিয়ে তার বদলে ধর্মমুক্ত সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এই শিক্ষক ও ছাত্ররা ১৯২৬ সালের জানুআরি মাসে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। 'শিখা' নামক একটি সাহিত্য পত্রিকাকে আশ্রয় করে যেহেতু এ রা আপনাদের মনোভাব ব্যক্ত করতেন, সে কারণে এঁদের 'শিখা গোষ্ঠী'ও বলা হতো। 'জ্ঞানের দিগন্তকে প্রসাবিত করা, বৃদ্ধি ও যুক্তির নির্দেশকে প্রতিষ্ঠা করা এবং ধর্মভীরুতার বদলে মনুষ্যত্ববোধকে লালন করা ছিল এই সমাজের লক্ষ্য।' আলোচ্য সমাজের উদ্দেশ্যে সম্বন্ধে সে গোষ্ঠীরই লেখক আবুল ফজল সংক্ষেপে যা বলেছেন, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এঁদের আন্দোলনের নাম দেওয়া হয় 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'।

'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' নামটি যেমন কাজী আবদুল ওদুদ-প্রদত্ত, তেমনি এ আন্দোলনের - আবুল ফজলের ভাষায় –তিনিই ছিলেন ভাবযোগী। আর এর কর্মযোগী ছিলেন আবুল হোসেন। কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন এ রা তখন অধ্যাপক। আর ছাত্র সদস্যদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আবুল ফজল ও সৈয়দ মোতাহার হোসেন চৌধুরী। পরবর্তীকালে উল্লিখিত এ পাঁচজন সাহিত্যিকই তাঁদের রচনায় উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন মুক্তবুদ্ধির। আনোয়ারুল কাদির, তাহেরউদ্দীন, আবদুল কাদির, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুল গনি –এঁরাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন এ আন্দোলনের সঙ্গে।

'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' যে বাৎসরিক অধিবেশন হতো, সেখানে পঠিত প্রবন্ধসমূহে মুসলিম সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও হীনমন্যতাকে, সেকালের তুলনায় যথেষ্ট কঠোর ভাষায় আক্রমণ করা হতো। মুসলমানদের জন্যে চাকুরি সংরক্ষণ রীতির ক্ষতিকারক

দিক, কামাল পাশার খেলাফত লোপের যৌক্তিকতা প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ পড়া হয়েছে এ সমস্ত অধিবেশনে। যাঁরা এ অনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করেছেন অতিথি হিশেবে তাঁদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম ও চারু বন্দ্যোপাধ্যায়েব নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ সমাজেব আলোচনা যে তৎকালীন সংকীর্ণতার অনেক উর্ধ্বে ছিলো তাব প্রমাণ পাই কট্টব মৌলানা আহমদ আলীব তীব্র বিরূপ সমালোচনা অথবা কাজী নজরুল ইসলামেব অকুণ্ঠ প্রশংসা থেকে। নজরুল তাব স্বকীয় ভঙ্গিতে এ সমাজেব মুক্ত বুদ্ধিব প্রশংসা কবে বলেছিলেন, 'আমি যখন সভায় প্রবেশ করলাম তখন অধ্যাপক আনোয়ারুল কাদিব সাহেব যে প্রবন্ধটি পড়ছিলেন তাতে স্পষ্টভাষায় উল্লিখিত হয়েছিলো ধর্মবিষয়ে মুসলমানদেব অন্ধতা ও মুসলমানদেব সমাজমানসেব সংকীর্ণতাব কথা। শুনে কেবলই আমি আশঙ্কা কবছিলাম এই বঝি পিঠে লাঠি পড়ল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেটি ঘটেনি। দেখলাম এই সমাজের অনেকগুলো লোক আমাব মতোই কাফেব।'

কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন ও কাজী মোতাহার হোসেন ছাড়াও এ সমাজের অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক সদস্য সৈয়দ মোতাহার হোসেন চৌধুবী এবং আবুল ফজল পববর্তীকালে পূর্ব বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে মুক্ত বুদ্ধির জয়গান উচ্চারণ কবেছেন। সৈয়দ মোতাহার হোসেন তাব 'সংস্কৃতি-কথা' ও 'সভ্যতা' গ্রন্থদ্বয়ে যে প্রশস্ত মানবতার কথা বলেছেন, তা স্ফটিকস্বচ্ছ মুক্তমনেরই পরিচায়ক। স্বল্পায়ু বলে তিনি যথেষ্ট লিখতে না পারলেও, তাঁর মহৎ প্রতিভার দ্যুতি দৃষ্টিকে কখনোই প্রবঞ্চনা করতে সক্ষম হয়নি।

আবুল ফজলের বয়স বর্তমানে প্রায় সত্তর বছর; কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় সাধারণ রীতি অনুসারে তিনি ধর্মীয় মোহে আচ্ছন্ন হননি। বরং প্রতিনিয়ত তাঁর মন আধুনিকতা ও

প্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ ভাবনায় তিনি ধর্মকে প্রাপ্যের চেয়ে বড়ো আসন কখনোই দেননি। পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি, ধর্মীয় শিক্ষার নামে সাম্প্রদায়িক শিক্ষাদানের প্রয়াস, কৃত্রিম ইসলামি সংস্কৃতি ও পূর্ব বাংলার এক-শ্রেণীর সাহিত্যিকের ইসলামি ও পাকিস্তানি সাহিত্য-রচনার প্রযত্ন সব কিছুকেই চিরতরুণ আবুল ফজল সাহসের সঙ্গে আঘাত করেছেন। এবং তাঁর মতো মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী সংস্কৃতিসেবীদের অব্যাহত সংগ্রামের মুখেই পূর্ব বাংলায় জন্মলাভ করেছে আজকের বহু প্রশংসিত অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি।

প্রাক-স্বাধীনতা কালের বাংলা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পাক সরকার বারংবার অস্বীকার করতে চেয়েছেন। সুবিধাভোগী ও সুবিধাবাদী সাংস্কৃতিক দালালরা সরকারের প্রস্তাবিত তহজিব ও তমদ্দুনের প্রচারে আপ্রাণ প্রযত্ন করেছেন। তব ধর্মীয় নেশা থেকে মুক্ত হবার যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন আবুল ফজল ও তাঁর মতো অন্য লেখকরা তা-ই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মের ক্ষীণ যোগসূত্র সম্বন্ধে আবুল ফজল বলেছেন, প্রচলিত ধর্মীয় আচার বা শিক্ষা সংস্কৃতি নয়। যে-কোনো ধর্মাবলম্বী হয়েও লোক আনকালচার্ড থাকতে পারে। সাম্প্রদায়িক সংস্কার ও তার মোহ ত্যাগ করতে না পারলে প্রকৃত সংস্কৃতিসাধক হওয়া যায় না। পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে অতঃপর আবুল ফজলের মন্তব্য, সরকারি সকল প্রচার সত্ত্বেও তা আব যাই হোক ধর্মীয় উত্তরাধিকার নয়। কেননা 'সংস্কৃতি আজ অনেকখানি পেশাওয়ারি রূপ নিয়েছে—ধর্ম আর ভূগোল তাতে আর এখন হালে পানি পাচ্ছে না।'

ধর্মসম্পৃক্ত রাজনীতি যে অত্যন্ত অবাস্তব, অনাধুনিক ও প্রতি-ক্রিয়াশীল এবং তার ফলাফল যে একান্তই বিষময় আবুল ফজল সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। পাকিস্তানের রাজনীতিতে ধর্মের

ধরতাই বুলি যে নিতান্তই রাজনৈতিক হাতিয়ার এবং মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামি, নেজামে ইসলাম, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রভৃতি কয়েকটি দল তাকে আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিশেবেই কাজে লাগায় (যদিও নিজেরা প্রচারিত আদর্শে অবিশ্বাসী), একথা সুস্পষ্টভাবে আবুল ফজল বলেছেন। রাজনীতিতে ধর্মের দোহাই দেওয়া আবুল ফজলের কাছে অনভিপ্রেত, তেমনি শিক্ষার মৌলনীতি হিশেবে ইসলামের কথা বলা তাঁর কাছে সমান ঘৃণার বস্তু। ১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়ার বর্তমান জঙ্গী সরকার একটি শিক্ষা-নীতি রচনা করেন। তাতে ধর্মীয় শিক্ষার প্রস্তাব ছিলো। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির সমর্থনে পূর্ব বাংলার সবগুলি বিশ্ববিদ্যা-লয়ের প্রায় সকল শিক্ষক এবং অন্যান্য উদার বুদ্ধিজীবী এক যোগে দাবি জানান। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে অবশ্য 'ইসলামি ছাত্র সংঘ' এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো -ইসলাম যাদের মূলধন ও হাতিয়ার প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামি ছাত্র সংঘের একটি ধর্মান্ধ ও ধর্মোন্মাদ ছাত্র, তাঁদের ভাষায়, এই মহান কারণে শহীদ হন। আবুল ফজল, যদিও মাদ্রাসায় লেখা-পড়া শিখেছেন এবং পড়িয়েছেন, প্রত্যাশিতভাবেই স্বভাববিরুদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষানীতির সমর্থন করতে পারেননি। 'সমকালীন চিন্তা' গ্রন্থে তাঁর সেই উদার ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বিধৃত আছে। 'সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন' 'সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র' 'রাঙ্গা প্রভাত' 'রেখাচিত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে ওঁর মুক্তমনের পরিচয় অনায়াসলভ্য।

স্বাধীনতা লাভের পূর্ব থেকেই বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মতো একটি ধর্মবিমুক্ত সাংস্কৃতিক ধারা বাঙালি মুসলিম-সমাজে চলে আসছিলো। তারই জন্যে অনুকূল পরিবেশে স্বল্পকালের পরিধিতে পূর্ব বাংলার অসাম্প্রদায়িক একটি চরিত্র গঠিত হতে পেরেছে। অকস্মাৎ মহাশূন্য থেকে এ ঔদার্য বাঙালিদের ওপর আরোপিত হয়নি, রীতিমতো সাধনার দ্বারা তাঁরা তা অর্জন করেছেন।

সাম্প্রদায়িকতা

"কোনো ধর্মই উদার ও অসাম্প্রদায়িক হতে এবং হৃদয় ও বোধের মহত্ত্বলাভে বাধা দেয় না। হজরত নিজামুদ্দিন আওলিয়া, মইনউদ্দিন চিশতী, শাহ জালাল, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি সাধককুলমণিগণ ধর্মভীরু ধার্মিক ছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু এঁদের সাম্প্রদায়িক ও ভেদবুদ্ধির ঘৃণ্য ব্যাধি স্পর্শ করতে সাহস করেনি। অন্য দিকে হাজী মহসীন, স্যার সৈয়দ আহমদ, মৌলানা আজাদ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি ধার্মিকগণ প্রগতির মশালবাহক ছিলেন। ধর্মই মানুষকে তাঁর আদিম যুগ থেকে পথ দেখিয়ে আজ অ্যাটমিক যুগে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। যা ন্যায় ও সত্য তাই ধর্ম এবং যা অন্যায় ও মিথ্যা তাই অধর্ম।"--৭ জুলাই-এর আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত জনাব ওবায়েদুল হক লিখিত 'ধর্ম ও বুদ্ধির মুক্তি, শীর্ষক চিঠির অংশবিশেষ উপরে উদ্ধৃত হলো। জনাব হক আলোচ্য চিঠিখানি লিখেছেন পয়লা জুনের আনন্দবাজারে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ 'বুদ্ধির মুক্তি-আন্দোলন'-এর সমালোচনা করে।

কোনো বিশেষ ধর্মের পক্ষে পত্রলেখক ওকালতি করেছেন, আপাতদৃষ্টিতে, তা মনে হয় না। কিন্তু তাঁর ইসলামপ্রীতি আহত হয়েছে, গোটা চিঠিটি পড়লে, তা স্পষ্ট হয়। সেই আহত অনুভূতিকে ব্যক্ত করতে গিয়ে, যদিও ধর্মনিরপেক্ষতার একটা স্টান্ট নিয়েছেন ওবায়েদুল হক, তাঁর প্রবল সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। বস্তুত, সরাসরি যিনি সাম্প্রদায়িক তাঁকে বোঝানো

সহজ ; কিন্তু একটা ছদ্মপ্রগতিশীলতার মুখোশ পরে যারা সাম্প্রদায়িকতার প্রচারে মুখর হন, সাম্প্রদায়িকতা উচ্ছেদ করার পথে তাঁরাই সবচেয়ে বড়ো বাধা। কেননা, সূক্ষ্ম সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে তাঁরা যুক্তি দিয়ে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চান। যুক্তিযুক্ত বলে তাঁরা বিবেককে চোখ ঠারেন, যদিও ফাঁকির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে সেই তথাকথিত যুক্তি।

এই জন্যে আমরা প্রায়শ শুনতে পাই, 'কোনো ধর্মই উদার ও অসাম্প্রদায়িক হতে এবং হৃদয় ও বোধের মহত্ত্বলাভে বাধা দেয় না। অথবা 'আপনি ভালো মুসলমান হলে এবং আমি উত্তম হিন্দু হলে আমরা অনাবিল শান্তিতে সহাবস্থান করতে পারি।' —এ জাতীয় উক্তির মধ্যে যেটুকু সত্য তা হলো এর ছদ্মপ্রগতিশীলতা, অন্য কিছু নয়। কেননা, কোনো বিশেষ ধর্মের সংজ্ঞা দ্বারা বিশেষিত করার সঙ্গে সঙ্গে মানবতা তার সর্বজনীনতা হারায়। খৃস্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে ধারণা দেয়, তা কি অভিন্ন অথবা পরস্পর পরিপূরক? অনেক ক্ষেত্রে তা বরং বিপ্রতীপ। যে মানবতার আদর্শ, সুতরাং, বিভিন্ন ধর্ম দান করে, তা পূর্ণতার নয়, খণ্ডিত বোধের দ্যোতক। সেই কারণেই বহু শতাব্দী ধরে ধর্ম মানুষকে মানুষ করতে পারেনি উপরন্তু অগণিত হানাহানি, রক্তারক্তির প্রত্যক্ষ প্রেরণা দান করেছে।

ইতিহাস এই অধর্মের অভ্রান্ত সাক্ষ্য দেয়। দুই ধর্মাবলম্বীরা দীর্ঘদিন এক দেশে পাশাপাশি সুখে ও শান্তিতে বাস করেছে, দুর্ভাগ্যক্রমে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।—না মুসলমান ও খৃস্টানরা ; না হিন্দু ও মুসলমানরা ; না হিন্দু ও বৌদ্ধরা ; না খৃস্টান ও ইহুদিরা ; না ইহুদি ও মুসলমানরা। প্রকৃত পক্ষে, পৃথিবীর বহু শতকের ইতিহাস বরং এবং এ সব সম্প্রদায়ের পরস্পর মাথা ফাটাফাটির অসংখ্য নজিরকেই উপস্থিত করে। ধর্মীয়

সংকীর্ণতার অনিবার্য ফলাফলসম্পর্কে ইতিহাস একান্ত সোচ্চার এবং শিক্ষা যদি নিতেই হয়, ইতিহাস থেকেই নিতে হবে— তত্ত্ব থেকে নয়। সেই ইতিহাসে, ভিন্ন ধর্ম দূরে থাক, একই ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর হানাহানির দৃষ্টান্তও কম মেলে না। খৃস্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাট মতভেদ এবং পরিণামে প্রবল দাঙ্গা অসংখ্য বার অনুষ্ঠিত হয়েছে। শাক্ত ও বৈষ্ণবদের বিরোধিতা এদেশে অত্যন্ত প্রকট। শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যেও দাঙ্গা কিছু কম হয়নি। এইতো মাত্র সেদিন আইয়ুব খার আমলে কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের মুসলমানদের বেছে বেছে সামরিক বাহিনীর সহায়তায় হত্যা করা হলো! সুতরাং ধর্ম ঔদার্য, অসাম্প্রদায়িকতা আর মহত্ত্বের প্রেরণা দান করে, এমন অবাস্তব দাবি অর্থহীন। বরং দেখতে পাই, ধর্ম মানবতাবোধকে সংকুচিত করে, মানুষে মানুষে ভেদের প্রাচীর গড়ে তোলে।

তা হলে, সেকুলার স্টেটগুলির ভবিষ্যৎ কী? ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে সেখানে কি অনাগত কাল পর্যন্ত কেবলি ধর্মীয় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে হানাহানি চলতে থাকবে? বলা যেতে পারে, মানসিকতার পরিবর্তন না হলে, ইতিহাসের গতি অন্যথা হওয়ার কারণ নেই। অর্থাৎ বর্তমানকালে ধর্ম সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের মধ্যে যে সামগ্রিক ঔদাসীন্য জন্মেছে, তার পরিপূর্ণ বিজয়ই কেবল অতীতের পুনরাবৃত্তি রোধ করতে পারে। অন্যথায় প্রবাদকে সার্থক করে ইতিহাস বরাবর তার শিক্ষাকে প্রচার করবে। ধর্মকে মেনে নিয়ে অসাম্প্রদায়িক হওয়ার চেষ্টার মধ্যে একটা বড়ো কনট্রাডিকশন হা করে আছে। অতএব আনুষ্ঠানিক ধর্মকে অস্বীকার করে, মানুষকে শুধুমাত্র মানুষরূপে দেখতে সক্ষম হলেই, সকল ভেদবুদ্ধি ঘুচতে পারে। তার আগে নয়।

সাম্প্রদায়িকতা বর্তমানকালে অবশ্য কেবল মাত্র ধর্মকে কেন্দ্র করে বেঁচে নেই। উপবৃত্তের মতো তার অন্য আর একটি কেন্দ্র

হচ্ছে অর্থনৈতিক শোষণ। ধর্মীয় নেশা এবং অর্থনৈতিক শোষণ আবার উভয় উভয়কে শক্তি ও সহায়তা দান করে। ব্রিটিশ রাজত্বকালে শিক্ষিত বিত্তবান হিন্দুরা অশিক্ষিত বিত্তহীন মুসলমানদের শোষণ করেছেন এবং সম্প্রদায় হিশেবেই হিন্দুরা শিক্ষা ও বিত্তলাভে তুলনামূলকভাবে বেশি সুযোগ লাভ করেছেন; একই কারণে। তাঁরা শোষণের পথকে সুগম করতে পেরেছেন। অপর পক্ষে, এ শতাব্দীর প্রথম পাদে, বাঙালি মুসলমানরা শুধু ধর্মীয় কারণেই শতকরা ৪৫টি সরকারি চাকুরি পেয়েছেন (শিক্ষাগত যোগ্যতা যা-ই হোক না কেন!)

এবং এই ধর্মীয় কারণেই, আমাদের সহকর্মী রাজশাহির অধ্যাপক তরুণ বসাক স্কলারশিপ পেয়েও গভর্নরের অনুমতির অভাবে বিদেশে যেতে পারলেন না। অজিতকুমার ঘোষ সবগুলি বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মারকস পেয়েও স্কলারশিপ পেলেন না।

এবং এই কারণেই ভারত সংবিধান অনুসারে সেকুলার হওয়া সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত কার্যত সেকুলার হতে পারেনি। সে দেশে হিন্দু ও মুসলমানদের পরস্পরের অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ যেমন আগে ছিলো, আজো তেমনি আছে। বরং মাইনরিটি বলে মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব আরো প্রবল হয়ে উঠেছে। এ জন্যেই তাঁদের অনেকেরই স্বদেশ ভারত হলেও আত্মিকভূমি পাকিস্তান। বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তাঁদের সহানুভূতির অভাব এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবেরই প্রত্যক্ষ প্রতি-ফলন। অপর পক্ষে, হিন্দুদের মনোভাবেরও সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে—হয়তো আদৌ হয়নি। সমাজ-অর্থনৈতিক কারণে তাঁরা দরিদ্র ও সাধারণ মুসলমানদের যেমন আগেও ন্যায়ত অথবা ভুলবশত হীন জ্ঞান করেছেন, আজো তেমনি তাঁদের প্রতি সমান অবজ্ঞা প্রদর্শন করছেন। তাঁরা বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া

সত্ত্বেও সংখ্যালঘু মুসলমানদের মনে একটা নিরাপত্তা ও সুবিচারের বোধ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার অব্যবহিত পরে ভারত যখন একটা ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান রচনা করেছিলো, তখন পর্যন্ত সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম হয়নি—দেশের নেতারা সংবিধানে তার প্রোভিশন রেখেছিলেন মাত্র। কিন্তু প্রোভিশন রাখা সত্ত্বেও আজো বস্তুত সে সেকুলার হতে পারেনি—সে কেবল যখন তখন হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হচ্ছে বলে নয়—হিন্দু ও মুসলমানরা পরস্পর নিজেদের বিশ্বাস ও সমান মনে করতে পারেনি বলেই সে প্রকৃত অর্থে সেকুলার হতে পারেনি। তাই দেখতে পাই মুসলমান-দের মধ্য থেকে কেউ কেউ এদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হলেও সামগ্রিকভাবে মুসলমানরা এক প্রতিকূল সমাজ-অর্থনৈতিক পরিবেশের শিকার হয়ে ক্রমাগত অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা হারিয়েছেন। এই জন্যেই স্বাধীনতা পরবর্তী দু দশকের মধ্যে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানে বহু মুসলমান প্রতিভাবান বলে পরিচিত হতে পারলেও, ভারতে এ সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো মুসলমান স্কলার আত্মবিকাশ করতে পারেননি। এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না যে, পাকিস্তানি মুসলমানরা প্রতিভাবান ও ভারতীয় মুসলমানরা প্রতিভাবর্জিত।

ধর্মীয় কারণে যখন এভাবে একটি সম্প্রদায় অন্য একটি সম্প্র-দায়ের তুলনায় বেশি অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করে, তখনই সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভেদবুদ্ধি জেগে ওঠে। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে অবিশ্বাসের চোখে দেখতে শুরু করে। আপনার সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির মধ্যে সান্ত্বনা খোঁজে। ব্যক্তি হিশেবে নয়, বরং সম্প্রদায় হিশেবে নিজেকে শক্তিশালী ও প্রবল করে তুলতে চায়। সম্মিলিতভাবে স্বার্থের লড়াই-এ লিপ্ত হয়। এই অবস্থাতেই মুসলিম লীগের জন্ম হয়। অথবা

বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়। এবং পরিশেষে ভারতবর্ষ পর্যন্ত দ্বিধাবিভক্ত হয়। এই কারণেই বিদেশী মুসলিম বাদশা ও সুলতানদের বিরুদ্ধে দেশীয় হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হন। অতীতকালে বৌদ্ধরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে কিংবা হিন্দুরা বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়েছেন এই ধর্মভিত্তিক শোষণ ও শাসনের কারণেই।

কিন্তু ভারতবর্ষীয় খৃস্টানদের বিরুদ্ধে হিন্দু অথবা মুসলমানদের কোনো বড়ো অভিযোগ নেই। কেননা, সম্প্রদায় হিশেবে দেশীয় খৃস্টানরা উল্লেখযোগ্য কোনো অর্থ নৈতিক শোষণের সুযোগ পাননি। অথবা বৌদ্ধদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও পূর্বোক্ত দুই সম্প্রদায় আপাত অসচেতন। সে-ও একই কারণে।

প্রকৃতপক্ষে, উদার মানবতাকে সংকীর্ণ করে ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তথা ধর্মীয় শিক্ষা। সেই সঙ্গে অর্থ নৈতিক শোষণ যদি মিলিত হয়, তা হলে ষোলকলা পূর্ণ হয়।

এমন কি, ধর্মীয় একতা সত্ত্বেও, শুধুমাত্র অর্থ নৈতিক শোষণ সাম্প্রদায়িক বোধকে প্রবলভাবে জাগিয়ে তুলতে পারে। মানুষে মানুষে এবং গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে—শোষণকে যদি এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, তা হলে গোষ্ঠীগত শোষণকে সাম্প্রদায়িকতার অন্যতম জনক বলে বিবেচনা করা যায়। এবং তেমন অবস্থাতে, কেবল অর্থ নৈতিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের ভিত্তিতেই সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটানো সম্ভব। সমাজতত্ত্ববিদ্ নন, অর্থনীতিবিদ্ নন, রাজনৈতিক-দার্শনিক নন, নিতান্তই কবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই সত্যকে অর্ধশতাব্দীকাল আগে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন, হিন্দু-মুসলমানদের বিবাদ মিটতে পারে একমাত্র অর্থ নৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে। তিনি বুঝেছিলেন, সামাজিক সাম্যের মুখে ধর্মীয় সংকীর্ণতা বিলুপ্ত হতে বাধ্য।

এই পথে অগ্রসর হলেই যথার্থ অর্থে সেকুলার স্টেট গড়ে উঠবে। এই পথ ধরেই যেটুকু হোক—বাংলাদেশ সেকুলার চেহারা

লাভ করেছে। উজান ঠেলে উল্টো পথে এগুতে চাইলে কিস্তি সামনে যাবে না, পণ্ডশ্রমের ঘাম ঝরবে রাশি রাশি। ধর্মের মহৎ শিক্ষার নামে কোনো দেশে কোনো কালে অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। আর ধার্মিক মানে ও কয়েকজন নিজামুদ্দিন আওলিয়া, মইনুদ্দিন চিশতী, শাহজালাল, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ নয়। তা ছাড়া, এরা ধার্মিক নিঃসন্দেহে, কিন্তু কতটা অসাম্প্রদায়িক তা প্রশ্নসাপেক্ষ। নিজামুদ্দিন আওলিয়া, মইনুদ্দিন চিশতী, শাহজালাল এদেশের হিন্দুদের কী 'উপকার' করেছেন, তাদের ধর্মান্তরকরণ ছাড়া? রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যে মায়ের পুজো করতেন, একজন মুসলমান কি তাঁকে মানতে পারেন? অথবা বিবেকানন্দ যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেখানে মুসলমানদের স্থান কতটা ছিলো? এ সব প্রশ্ন না তুলে এদের সকলকে অসাম্প্রদায়িক বলে মেনে নিলেও, বলা যায় এরা তো কোটিতে কোটিতে জন্মগ্রহণ করেন না, অথচ আমাদের কাজ সমাজের লক্ষকোটি মানুষকে নিয়ে। সুতরাং সেই মানুষদের অসাম্প্রদায়িক করে তুলতে হলে ধর্মের নেশা ছাড়াতেই হবে।

যদিও ওবায়েদুল হক বলেছেন তবু আমার জানা নেই হাজী মহাম্মদ মহসীন অথবা স্যার সৈয়দ আহমদ কী অর্থে প্রগতিশীল। যদ্দুর জানি উভয়েই আপন সম্প্রদায়ের লোকদের উপকার করার চেষ্টা করেছেন। আর রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর যুগের তুলনায় নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল ছিলেন; কিন্তু আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি তাঁদের তো সামান্যতম সহানুভূতি অথবা বিশ্বাস ছিলো না। বরং বিদ্যাসাগর যে মানুষকে একান্তভাবেই মানুষরূপে দেখতে পেয়েছেন, তাঁর সে মুক্ত দৃষ্টি হয়তো লাভ করেছেন তার নাস্তিক্যের মাধ্যমেই। এবং দৈবাৎ বিদ্যাসাগর অথবা রবীন্দ্রনাথের মতো আনুষ্ঠানিকতার ঠুলিমুক্ত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন বলেই এখনো মানবধর্ম টিঁকে আছে—ধর্মের বুজরুকির মুখেও মানবতা বেঁচে আছে। এবং ধীরে

ধীরে ধর্মের কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। মানুষ অসাম্প্রদায়িক হচ্ছে, শিক্ষিত হচ্ছে—ওবায়তুল হকের ভাষায় অ্যাটমিক যুগে পৌঁছে যাচ্ছে। অন্য দিকে ধর্ম যদি তার প্রতাপ বজায় রাখতে পারতো, তাহলে আজও বলতে হতো পৃথিবী চ্যাপটা কি বা সূর্য ঘোরে পৃথিবীর চারদিকে।

সাম্প্রদায়িকতা ও বাংলাদেশ

পঁচিশে জুলাই মহাবোধি সোসাইটি হলে একটি সেমিনার আয়োজিত হয়েছিলো। বেরিয়ে আসছিলুম। দরজায় এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভারি সুন্দর চেহেরা, বয়স বাইশ-তেইশ। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বেশ তো বক্তৃতা করলেন; কিন্তু ১৯৪৭ সাল থেকে যত হিন্দু এসেছেন পূর্ব বাংলা ছেড়ে তাঁদের ঠেকালেন না কেন আপনাদের বঙ্গবন্ধু?' আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলুম, 'কখনকার কথা বলছেন?' ভদ্রলোক বললেন, '১৯৪৭ সাল থেকে!'

জানি, এ প্রশ্ন-বিচ্ছিন্নভাবে শুধু এ ভদ্রলোকের নয়; বাংলা দেশ প্রসঙ্গে এ প্রশ্ন অনেকের মনেই উঁকি দেয়। কেউ মুখ ফুটে বলেন, কেউ বলেন না। এ প্রশ্ন মনে জাগাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমরা যেহেতু ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলুম, তাই প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি কী করে পূর্ব পাকিস্তান পূর্ব বাংলা হলো এবং কী করে পূর্ব বাংলা বাংলা দেশ হলো। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের জনগণ, যাঁদের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘকাল কোন যোগাযোগ ছিলো না, হঠাৎ একদিন 'জয়বাংলা' শ্লোগান শুনে নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছেন- অনেক প্রশ্ন ভিড় করে এসেছে সে মুহূর্তে তাঁদের মনের কোণে--তারপর অবশ্য পূর্ণ সহানুভূতি নিয়ে নিপীড়িত বাঙালদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু প্রশ্নগুলোর উত্তর তাঁরা আজো পাননি। তাঁরা তো জানেন ২৪ বছর আগে পূর্ব বাংলার লোকেরাই ভোট দিয়ে জিতিয়েছিলেন মুসলিম লীগকে।

এবং মুসলিম লীগকে এঁরা ভোট দিয়েছেন একটি স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র—পাকিস্তান গড়ে তোলাবার জন্যেই। এ বঙ্গের লোকেরা আরো জানেন যে, পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের একান্ত বিষম দুটি জাতি একত্রিত হয়েছিলো কেবল ইসলাম ধর্মেরই নামে। তাহলে আজ শতাব্দীর এক পাদের মধ্যেই সেই বাঙালি মুসলমানরা ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিরোধী হয়ে সর্বাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হলেন কেন? পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্বে এরা কি পাকিস্তানের পক্ষে বিপুল ও আন্তরিক উৎসাহ দেখান নি? অথবা পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরে এরা কি পাকিস্তানের যথেষ্ট অনুগত নাগরিক ছিলেন না?

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের কারণ নেই, একটি ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক হিশেবে বাস করার উদ্দেশ্যেই পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ পাকিস্তানের পক্ষে মুসলিম লীগকে ভোট দিয়েছিলেন। তাদের মনে নিশ্চয় এমন উচ্চাশা ছিলো যে, ইসলামের সাম্য-মৈত্রীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান ন্যায় বিচার থেকে তাদের বঞ্চিত করবে না। কিন্তু এ মোহ ভাঙতে বেশি সময় লাগেনি। তাই পাকিস্তানের জন্মের মাত্র সাত বছর পরে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে, দেখতে পাচ্ছি, ৩০৯টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পাকিস্তানস্রষ্টা মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসনে বিজয়ী হয়েছে। যে দল কেবল ধর্মীয় কারণে একদা মুসলমানদের একচেটিয়া ভোট পেয়েছিলো, সেই দলই সাত বছর পরে আর ভোট পায়নি। কেননা, তখন সংগ্রাম আর হিন্দুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়নি, তখন সংগ্রাম শুরু হয়েছে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধিকার অর্জনের। মোহমুক্ত বাঙালিরা দেখেছেন ধর্মের নামে তাঁরা যে রাষ্ট্র গঠন করেছেন, সে রাষ্ট্রে ধর্ম সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে না, বরং দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণ সংখ্যাগরিষ্ঠকে শোষণ করেন ধর্মের নামে। এই শোষণের

পরিমাণ ও তীব্রতা ক্রমশ জ্যামিতিক নিয়মে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেটাই সকল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক নিয়ম। এই বিপুল অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মুখে ধর্মের মোহ কদ্দিন থাকে? ধীরে ধীরে তাই বাঙালিরা হতাশ হয়েছেন; ধর্মের ওপর তাঁদের আস্থা বিচলিত হয়েছে।

তদুপরি, বর্ধিত অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভ করে, চিরকাল যাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, সেই হিন্দুদের প্রতি বাঙালি মুসলমানরা ক্রমশ বিদ্বেষমুক্ত হয়েছেন। এ কথা তো অস্বীকার করা যাবে না যে, একদা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বড়ো রকমের অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিলো। দৈবাৎ পূর্ব বাংলার জমিদার, মহাজন, উকিল, ডাক্তার যেহেতু হিন্দু ছিলেন এবং সেখানকার অধিবাসীর অধিকাংশ যেহেতু মুসলমান ছিলেন, সে কারণে, যদিও শোষণ করেছেন শোষকরা, তবু নাম হয়েছে হিন্দুদের। সেই হিন্দুদের প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতা থেকে বেঁচে মুসলমানরা প্রথম দিকে উল্লসিত হয়েছেন, হয়তো অতীতের কথা স্মরণ করে কেবল মাত্র ধর্মীয় কারণে, এমন কি দরিদ্র একজন হিন্দুকেও আঘাত করেছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে হিন্দুবিদ্বেষ ঘুচে গিয়ে ক্রমশ পশ্চিমীবিদ্বেষ জন্ম নিয়েছে। তাই বলে হঠাৎ কোনো এক বসন্তের প্রভাতে অথবা শরতের প্রদোষকালে এই ইসলামপ্রীতি ও হিন্দুবিদ্বেষ ফিকে হয়নি। অথবা আজ পূর্ব বাংলায় ঘোর ইসলামভক্ত কিংবা প্রবল সাম্প্রদায়িক মানুষ নেই, এ কথাও সত্য নয়। আমার বক্তব্য, পূব বাংলায় অসাম্প্রদায়িক মানুষের সংখ্যাই এখন বোধ হয় বেশি। সেই কারণে, গত নির্বাচনের সময়ে দেখেছি ইসলাম পসন্দ্ দলগুলি জামাতে ইসলামি, মুসলিম লীগ ও পি ডি পি পরাজিত হয়েছে, নজিরবিহীনভাবে জয়ী হয়েছে একটি দল একমাত্র যার ম্যানিফেস্টোতে এ কথা বলা হয়নি যে, পাকিস্তান একটি ইসলামি রাষ্ট্র হবে।

প্রতিকূল পরিবেশে যে সাম্প্রদায়িক লোকেরা এতকাল নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলো পূর্ব বাংলায়, আজ সামরিক বাহিনীর আনুকূল্যে তারাই বর্বরতম রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটা কি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত? ডাকাত ও গুণ্ডার কী বিশেষ কোনো জাত আছে? তদুপরি আজ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বাঙালিরা গুণ্ডাদের বাধা দিতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছেন না: এমন অবস্থায়, যে অগণ্য হিন্দুদের ওপর অশেষ নির্যাতন হয়েছে, তা একান্তভাবে শোচনীয় ও শোকাবহ; কিন্তু একেবারে অস্বাভাবিক নয়। মুক্তিবাহিনী গুণ্ডাদের যথোচিত শাস্তি দিচ্ছেন এবং শাস্তি দানের পালা শেষ হয়নি, শুরু হয়েছে মাত্র। সেকুলার স্টেট ভারতেও গুণ্ডারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কম করেনি এবং এখানকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা সে দাঙ্গা অথবা প্রাত্যহিক দলীয় দাঙ্গা রুখতে পারছেন না। অথচ রুখতে গিয়ে তাদের একটি জঙ্গীবাহিনীর প্রতিকূলতার সম্মুখীনও হতে হচ্ছে না। তাই বলে ভারত সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র এটা বোধ হয় কেউ স্বীকার করবেন না।

প্রসঙ্গত আরো একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। পূর্ব বাংলার ওপর সর্বাত্মক শোষণ চালানোর পথে পশ্চিম পাকিস্তানের সামান্য একটু চক্ষুলজ্জার কারণ আছে। পূব বাংলায় দেশের অধিকাংশ লোকের বাস। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র, এ কারণে, পূব বাংলাকে সংখ্যালঘিষ্ঠ করার অনেক কসরৎ করেছেন। এবারের রক্তস্নান ছাড়াও সমুদ্র-উপকূলে বাঁধ নির্মাণ করা হয়নি কিংবা বন্যা-নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি হয়তো এ কারণেই। এবং এ কারণেই সরকারি উদ্‌যোগে দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়েছে কয়েকবার। শাসকগোষ্ঠীর ধারণা ছিলো ভীতি প্রদর্শন করে হিন্দুদের সকলকে তাড়াতে পারলেই পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লোপ পাবে। সেই সঙ্গে কল্পিত ভারতপ্রীতির প্রচারও বন্ধ হয়ে যাবে হিন্দুদের বিতাড়নের ফলে। কিন্তু সরকারি দাঙ্গা সকল সময়ে সফল অথবা ব্যাপক

হতে পারেনি মুক্তবুদ্ধি লোকেদের জন্যে। এবারে তাঁরা অনুপস্থিত। সেই সুযোগে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও প্রলোভন স্বভাবতই প্রবল হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু আমাদের আলোচনা দেশের অধিকাংশ মানুষকে নিয়ে। তাঁরা যে ইসলাম সম্পর্কে অন্ধতা ত্যাগ করেছেন অথবা অসাম্প্রদায়িক হতে চেষ্টা করেছেন, বাংলাদেশের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে, এটা সম্ভবত স্বীকার করতে হবে। অথচ একদিন এই বাঙালিরা বিশেষভাবে পাকিস্তানি ছিলেন, সে কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। যে আওয়ামি লীগ আজ অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে পরিচিত হয়েছে দেশবিভাগের পরে জন্মকালে তারই নাম ছিলো আওয়ামি মুসলিম লীগ। সেদিন ঐতিহাসিক কারণেই শেখ মুজিবর রহমান বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেননি অথবা আওয়ামি লীগ সেকুলার চরিত্র লাভ করেনি। কিন্তু গত ২৩ বছরের বহু ভাঙাগড়ার মাঝে ইতিহাসের গতি ধরে অপরিচিত একটি নাম আজ বঙ্গবন্ধু বিশেষণে অগণিত মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করেছে। এবং ঐতিহাসিক কারণেই আওয়ামি লীগ ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন অধিকার করেছে। ঐতিহাসিক কারণেই ১৯৪৭ সালে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়েছে ও স্বাধীনতা পেয়েছে এবং ১৯৭১ সালে আবার পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হলো এবং বাংলা দেশের জন্ম হলো।

কাঁঠাল হয়তো জোরজুলুম করে কিছু আগে পাকানো যায়; কিন্তু অনিবার্য না হওয়া পর্যন্ত ইতিহাস কখনোই সৃষ্ট হয় না। তাই যদি কেউ প্রশ্ন করেন ১৯০০ সালে কেন ভারত স্বাধীন হলো না, আমার জন্ম কেন ২০০ বছর আগে হলো না, শেখ মুজিব কেন ১৯৫০ সালে বঙ্গবন্ধু হলেন না কিংবা ১৯৪৭ সালে কেন 'বাংলা দেশ' হলো না, তাহলে একযোগে সবগুলার উত্তরে বলা যায়, সেটা সম্ভব ছিলো না।

পূর্ব বঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

পূর্ব বাংলার বাঙালিত্বকে মুছে ফেলার প্রয়াস ছিলো পাকিস্তানি নেতাদের। তাঁরা আশা করেছিলেন পূর্ব দিগন্তে বাস করেও বাঙালিরা স্বপ্নে বিচরণ করবেন আরব-ইরানে। দোয়েল-কোয়েল ডাকা তালতমালজারুলহিজল বনে বেষ্টিত থাকলেও সে দেশের কবিরা কবিতা লিখবেন খেজুর-বাবলা আর বুলবুলি নিয়ে। কিন্তু স্বভাব স্বীকরণ করে না এমন অসম্ভব এবং উদ্ভট পরিকল্পনাকে। সংস্কৃতি কি কলকারখানার ছাচে ঢেলে তৈরি করা যায়? সে থাকে মনোলোকের গভীরে। ভাষার মতো সব অত্যাচারকে অগ্রাহ্য করে সে প্রকাশ করে আপন স্বরূপকে। পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির ওপর সরকারি জুলুম এসেছে নানাপথে। রবীন্দ্রনাথের ওপর উদ্ধত আক্রমণ তার অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের পরাজয় এবং বিলোপ যেহেতু বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পরাজয় এবং বিলোপের নামান্তর তাই তিনি হিন্দু বলে, মুসলিমবিরোধী বলে, পক্ষপাতদুষ্ট বলে নিন্দিত হয়েছেন। সুপরিকল্পিতভাবে তাঁর রচনা বর্জিত হয়েছে পাঠ্যপুস্তক থেকে, পাকভারত যুদ্ধের নাম করে নিষিদ্ধ হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার। (যেন রবীন্দ্রনাথ একজন ভারতীয় সৈনিক!)

কিন্তু পাকিস্তানি হয়েও যারা ভোলেননি তাঁদের বাঙালিত্বকে, রবীন্দ্রনাথকে সকল রূঢ় আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার কাজকে তাঁরা বিবেচনা করেছেন পবিত্র দায়িত্ব এবং কর্তব্যরূপে। এঁদের চোখে বঙ্গ সংস্কৃতির প্রতীক হয়েছেন

রবীন্দ্রনাথ। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ওখানকার মানুষের যে উৎসাহ সম্ভবত তা কেবল সাহিত্যসঙ্গীতের জন্যেই নয়। 'ছায়ানটের' সঙ্গীতানুষ্ঠানে উপস্থিতির সংখ্যা যে অযুতের ঘরে পোঁছতো তার কারণ এ নয় যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমঝদারের সংখ্যা ওখানে অতো বেশি। বরং নিপীড়ন ও নিগ্রহের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অতো প্রবল বলেই ক্রমশ স্ফীত হয়েছে এই সংখ্যা। তদুপরি শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা রবীন্দ্রনাথে শুনেছিলেন এক উদার মানবতার বাণী, কোনো ধর্মীর সংকীর্ণতা যাকে খাটো করে না কোনো আচারের দৈন্য যাকে কুৎসিত করে না, কোনো ইজম্ যাকে নিয়ন্ত্রিত করে না। সেই মহৎ মানবতার আহ্বান রাষ্ট্রীয় সীমানার সুউচ্চ প্রাচীর এবং ধর্মীয় আচারের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানকে পরাস্ত করে অনায়াসে। জন্ম নেয় এক নতুন চেতনা। সে চেতনা স্বদেশ আর স্বকীয় সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম ও অশেষ ভালোবাসার। মানুষকে মানুষ বলে স্বীকার করার। পশ্চিমবঙ্গের যে অংশ এই প্রশস্ততাকে অঙ্গীকার করেছে তার সঙ্গে এভাবে পূর্ববঙ্গের সম্মিলন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের সুর দিয়ে ঐক্য রচিত হয়েছে দুটি আপাত বিপ্রতীপ মতের।

তথাপি একথা অবশ্যস্বীকার্য পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্রচর্চার যে ধারা প্রবাহিত তার রঙ আলাদা, তার গতি ভিন্ন। প্রবল রিপু তাদের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথকে বাঙালিরা অর্জন করেছেন নতুনরূপে, আত্মসাৎ করেছেন এমনভাবে যাতে বহিঃশত্রুর অপহরণের ভীতি বিদূরিত হয় চিরতরে। উপনিষদের পটভূমিকায় ঋষির মূর্তিতে অথবা গুরুদেবরূপে তিনি বাঙালিদের চোখে ধরা দেননি। জীবনদেবতা নয়, তাঁর মানবতা-বোধই বরণীয় ও-বাংলার কাছে। এই কারণে, আনিসুজ্জামানের কাছে রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তাই প্রাধান্য লাভ করে। আক্রাম তাঁর উপন্যাসের সমাজচিত্র বিশ্লেষণে তৎপর। মুহম্মদ আবদুল

হাই তাঁকে বিচার করেন ভাষাতাত্ত্বিক হিশেবে। হায়াৎ মামুদ ব্যাপৃত তাঁর প্রেমের উৎস সন্ধানে। তাঁর গণসচেতনতা গবেষণার বিষয় হয় ওখানকার গবেষকের কাছে। আনিসুজ্জামান সম্পাদিত গোটা 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে মূল্যায়নের যে প্রয়াস এবং যে মেজাজ বিধৃত তা স্বতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে। সে কারণেই, সম্ভবত, সকল ঘূর্ণিঝড়ের বৈপরীত্য সত্ত্বেও ওখানে রবীন্দ্রনাথের এক নিষ্কলঙ্ক মূর্তি নির্মীয়মাণ আর এ বাংলায় তার নিষ্প্রাণ মর্মরমূর্তিও বিচূর্ণ। এ বাংলার রাজনীতির তিনি করুণ শিকার, ওপারের রাজনীতি তাঁকে নতুন জন্ম দেয়। স্বাধিকার সংগ্রামের প্রতীক রবীন্দ্রনাথের নতুন জন্ম আবার ওপারের রাজনীতিকে দুর্বার বেগে পরিচালিত করে নতুন পথে। কোনো দেশে কোনো কালে কোনো সত্যদ্রষ্টা কবি এমন প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছেন সে দেশের সমাজচিন্তাকে ?

বাংলাদেশের পত্রপত্রিকা

সংবাদপত্রের পূর্ণস্বাধীনতা পাকিস্তানে কোনো কালে ছিলো না। গত তেরো বছরের সামরিক শাসনের পূর্বে তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসনের কালেও না। কেননা, পাকিস্তান নির্মাতাগণ দেশে ঐক্য আনতে চেয়েছিলেন সত্যকে চাপা রেখে, তবু বাংলা দেশের সংস্কৃতি ও রাজনীতিক্ষেত্রে স্বল্পকালের মধ্যে যে বিপুল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই পত্রপত্রিকা তাতে একটা সুবৃহৎ ভূমিকা নিয়েছে। বস্তুতপক্ষে, গণমাধ্যম হিশেবে পত্রপত্রিকা সকল দেশেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে, পূর্ব বাংলাতেও করেছে। বরং বলা যেতে পারে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশিই করেছে। কেননা অধুনালুপ্ত পাকিস্তানের অন্য দুটি গণমাধ্যম বেতার ও টেলিভিশন ছিল পুরোপুরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে। এ দুটি প্রতিষ্ঠান জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত, লালিত অথবা উৎসাহিত করেনি, সারাক্ষণ সরকারি প্রচারেই আত্মনিয়োগ করেছে। কিন্তু মানুষ প্রচারকে সর্বদা স্বাগত জানায় না। তদুপরি পাকিস্তানের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ের আগে পর্যন্ত বেতার যথেষ্টসংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছয়নি। টেলিভিশন এখনো কেবল মুষ্টিমেয় মানুষের নাগালে আসতে পেরেছে! এমতাবস্থায় স্বশাসনের দাবি ও চিত্তজাগরণকে জনপ্রিয় করার দায়িত্ব বহন করেছে পূর্ব বাংলার দৈনিক ও সাময়িক পত্রগুলি। ধূর্ত আইয়ুব সরকারও জানতেন প্রচারকার্যকে সর্বাত্মক ও কার্যকর করতে হলে শক্তিশালী পত্রিকার সাহায্য আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এই কারণে, আইয়ুব

প্রেস ট্রাসটের জন্ম দিয়েছিলেন। প্রেস ট্রাসটের কাজ ছিলো পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করা এবং অন্য পত্রিকার প্রচারকে খণ্ডন করা।

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে পূর্ব বাংলায় এমন কোনো পত্রপত্রিকা ছিলো না যা আঞ্চলিক স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি পুরো সচেতন ছিলো। বরং প্রায় সব কটি পত্রিকাই ধর্মের গাঁজা বিতরণে মুক্তহস্তে ছিলো। ইসলামের জিগির তুলে কায়েমি স্বার্থবাদীদের দালাল এই পত্রিকাগুলি জাতীয় সংহতির নামে পূর্ব বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতিকে উন্মূল করতে চেয়েছে এবং পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর লোকেরাই এই পত্রিকাগুলি পরিচালনা করতেন। পাকিস্তানের জন্মের পরেই, বিশেষ করে, রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে এদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়। কিন্তু সবগুলি পত্রিকা এই জনবিরোধী ভূমিকা নিলে, বলা বাহুল্য, মুক্তবুদ্ধির বিকাশ সম্ভব হতো না অথবা কালে কালে স্বাধীন বাংলার দাবিও জনপ্রিয় হতে পারতো না। কিন্তু সংবাদপত্র যেহেতু জনমত দ্বারা এবং জনমত যেহেতু সংবাদপত্রের দ্বারা অনেকাংশ নিয়ন্ত্রিত, সে কারণে, পূর্ব বাংলায় ধীরে ধীরে জন্ম হয়েছে যথার্থ পূর্ববঙ্গীয় পত্রিকার। এবং এই পত্রিকাগুলিই শেষ পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ একটি বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে সহায়তা করেছে।

পাকিস্তানের ভিত্তি দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য পরস্পর পরিপূরক নয়, এ কথা পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন। এই জন্যেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি যখন উঠলো, তখন তাকে নির্মূল করতে উদ্যত হন এই নেতৃবৃন্দ। টেলিভিশন তখনও দেশে নির্মিত হয়নি, অথবা বেতার তখনও গণমাধ্যম হিশেবে জনপ্রিয় হতে পারেনি। এমন অবস্থায় দৈনিক মরনিং নিউজ এবং সাপ্তাহিক যুগভেরী, সৈনিক ও আসাম হেরালড্ প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বাংলা ভাষাবিরোধী

ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। আলোচ্য পত্রিকাগুলি ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের আগে থেকেই উরদুর পক্ষে এবং বাংলার বিরুদ্ধে নানা প্রচার চালাতে থাকে। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে মরনিং নিউজ বলে যে, পূর্ব বাংলার সকল মানুষ উরদু বোঝেন এবং উরদু বলতে পারেন। পত্রিকায় আরও বলা হয়, ইসলামি সংস্কৃতির সম্যক বিকাশের জন্যে উরদু ভাষায় প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। ঢাকার তমদ্দুন মজলিশ তখন বাংলা ভাষার পক্ষে জনমত-গঠনে তৎপর ছিল। মরনিং নিউজ এ প্রতিষ্ঠানের নিন্দায়ও মুখর হয়ে ওঠে। ১৯৪৮ সালের ফেবরুআরি ও মারচ মাসে বহু অপপ্রচারের মাধ্যমে মরনিং নিউজ ও উল্লিখিত সাপ্তাহিকগুলি ভাষা আন্দোলনকে পাকিস্তানবিরোধী ও সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে চেষ্টা করে। পত্রিকাগুলি তারস্বরে ঘোষণা করে এ আন্দোলন ভারতীয় দালালদের দ্বারা সৃষ্ট।

মাওলানা আকরাম খাঁর 'আজাদ' ও আবুল মনসুর আহমদের 'ইত্তেহাদ' পত্রিকাও ছিলো ইসলামঘেষা, তথাপি তারা এ অপপ্রচারের প্রতিবাদ না করে পারেনি। বাস্তবিক পক্ষে, আজাদ ও ইত্তেহাদ বাংলা ভাষার দাবিকে গণতান্ত্রিক ও ন্যায্য বলে সমর্থন করে। দুটি পত্রিকাই পূর্ব বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনের গণপরিষদের ভাষণকে অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে নিন্দা করে।

কিন্তু তথাপি এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এমন কোনো পত্রিকা ছিলো না পূর্ব বাংলার স্বার্থরক্ষায় সর্বাত্মকভাবে যে সচেষ্ট হবে অথবা প্রয়োজনবোধে সরকারি প্রচারণার বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রামে লিপ্ত হবে। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন যে পুরোপুরি সফল হতে পারেনি, অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কার্যকর গণমাধ্যমের অভাব তার অন্যতম।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়ে কমপক্ষে একটি দৈনিক

ও একটি সাপ্তাহিক ছিল যা এ আন্দোলনকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন ও উৎসাহ দান করেছে। এ পত্রিকা দুটি যথাক্রমে পাকিস্তান অবজারভার ও ইত্তেফাক। জনমনে তার প্রভাব দৃষ্টে তদানীন্তন নুরুল আমিন সরকার পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার প্রকাশ নিষিদ্ধ করেন ১৩ ফেবরুআরি। একই সঙ্গে এ পত্রিকার সম্পাদক আবদুস সালাল হন কারারুদ্ধ। ভাষা আন্দোলনের প্রতি এ ছিল একটি রূঢ় আঘাত। তথাপি একুশে ফেবরুআরির আন্দোলনকে খর্ব করা যায়নি। গণ-অভ্যুত্থানের মুখে বাংলা ভাষার প্রবল বিরোধী পাকিস্তান সরকারকেও বাংলার দাবি মেনে নিতে হয়।

এ আন্দোলনকালে মরনিং নিউজ যথারীতি বাংলার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে, একুশে ফেবরুআরির বিক্ষোভকে এ পত্রিকা ভারতীয় দালালদের ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করে। যা ছিল অগণিত মানুষের প্রাণের দাবি, তাকেই এ পত্রিকা অবজ্ঞা ও উপহাস করে। বাইশে ফেবরুআরি সংখ্যায় এ পত্রিকায় ব্যানার হেড লাইনে সংবাদ বেরোয় :

Dhoties roaming Dacca Street police forced to resort firing on unrully mob. Government brought the situation under control.

এই ঔদ্ধত্য ও দুঃসাহসের মাশুল দিতে হয় মরনিং নিউজকে। বিক্ষুব্ধ জনতা ওই দিনই মরনিং নিউজের সদরঘাটের অফিসটি পুড়িয়ে দেয়। জনপ্রতিরোধের জন্যে, এমনকি, দমকলবাহিনী গিয়েও অফিসটি রক্ষা করতে পারেনি।

ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই অতঃপর পূর্ব বাংলার জনগণ আপনাদের রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থবিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন। স্বভাবতই জনগণের মতাদর্শের পরিপোষক হিশেবে পাকিস্তান অবজারভার, ইত্তেফাক, সংবাদ প্রভৃতি পত্রিকা ক্রমশ পরিচিত হয়েছে। অপর পক্ষে, মরনিং নিউজ, আজাদ প্রভৃতি

পত্রিকা আপনাদের ললাটে অদৃশ্য সরকারি ছাপ এঁকে সরকারি পৃষ্ঠপোষণায় আপনাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের নজিরবিহীন বিপর্যয়, ১৯৬২ সালের আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী মনোভাব ও নির্বাচনে গণতন্ত্রের প্রতি বিপুল জনমত সৃষ্টি, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলার দাবি উত্থাপন প্রভৃতি আংশিকভাবে সম্ভব হয়েছে কয়েকটি পত্রিকার অব্যাহত প্রচারের ফলেই। সমান্তরালভাবে একই সময়ে অবশ্য এই জনপ্রিয় আন্দোলনগুলির বিরুদ্ধে একটি চক্র সক্রিয় ছিলো এবং এদের মুখপত্রগুলি জনবিমুখ কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলো।

স্বতন্ত্রভাবে পূর্ব বাংলার সংবাদপত্রগুলির ভূমিকার আলোচনা ও মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

পাকিস্তান অবজারভার ও পূর্বদেশ

পঞ্চাশ দশকে ও ষাট দশকের প্রথমার্ধে পাকিস্তান অবজারভার একটি প্রগতিশীল পত্রিকারূপে পরিচিত ছিলো। বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করার ফলস্বরূপ পত্রিকাটি লীগ সরকারের রোষে পতিত হয়, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু ষাট দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই পূর্ব বাংলার স্বশাসনের দাবি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের শ্লোগান যত জনপ্রিয় হতে থাকে, অবজারভার ততই জনতা থেকে দূরে সরে যায়। সংক্ষেপে অবজারভারের নীতি হচ্ছে গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন ও শক্তিশালী পাকিস্তান। গণতন্ত্র ও শক্তিশালী পাকিস্তানের মধ্যে যেকোনো আপস চলতে পারে না, এ সত্যের প্রতি অবজারভার সম্ভবত স্বেচ্ছায় চোখ বুজে ছিলো। যে দেশে শতকরা ৫৬ জন মানুষ শতকরা ৪৪ জন মানুষের চেয়ে ন্যূন অধিকার লাভ করে, গণতন্ত্র

যে সেখানে অর্থহীন ধুয়োমাত্র, অবজারভার বোধ হয় ইসলামের প্রতি অবচেতন আস্থা ও অনুরাগবশত তা উপলব্ধি করতে পারেনি। এই জন্যে ৬৫ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামি লীগ যখন এন ডি এফ থেকে বেরিয়ে এসে দুর্বল কেন্দ্রের অধীনে পূর্ণ স্বশাসনের দাবি জানায়, তখন থেকে অবজারভার ডান দলগুলির, বিশেষত, বৃদ্ধ অথর্ব রাজনীতিকগণের সমন্বয়ে গঠিত পি ডি পি-র মুখপত্র হিশেবে কাজ করতে শুরু করে।

অবজারভারের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রকাশ পায় যখন ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে সে 'ইসলাম পসন্দ্'-দলগুলির প্রতিনিধিত্ব করতে আরম্ভ করে। সম্পাদক আবদুস সালাম একাধিক প্রবন্ধে 'জয় বাংলা' শ্লোগানটির কদর্থ করে তার নিন্দা করেন। এমনকি, জয় শব্দটির মধ্যে তিনি হিন্দুত্ব আবিষ্কার করে শিউরে ওঠেন। শেখ মুজিবুর রহমানের বিপুল জয়কেও অবজারভার প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেনি, অথচ আওয়ামি লীগ এবার প্রায় সকল মানুষের সমর্থন লাভ করেছিলো। এ ছাড়া, একদিন যে বাংলা ভাষা আন্দোলনের বড়ো সহায়ক ছিলো অবজারভার, সেই অবজারভারই নির্বাচনের সমকালে হঠাৎ বাংলা হরফের পরিবর্তে রোমান হরফ প্রবর্তনের ওকালতিতে মুখর হয়ে ওঠে। প্রতিক্রিয়াশীল ও জনবিমুখ ভূমিকার জন্যে ১৯৭১ সালের ফেবরুআরি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালের শিক্ষকরা একটি অনুষ্ঠানে অবজারভারের একটি সংখ্যা আগুনে পুড়িয়ে তাঁদের প্রতিবাদ জানান।

অবজারভার গোষ্ঠীর বাংলা পত্রিকা 'পূর্বদেশ'। বলা বাহুল্য, মতাদর্শের দিক দিয়ে তাদের কোনো প্রভেদ নেই। কেবল পূর্বদেশের প্রতিক্রিয়াশীলতা বোধ হয় অবজারভারের থেকে কিছু বেশি সুক্ষ্ম ছদ্মবেশে ঢাকা। সম্পাদকের ব্যক্তিগত মতের প্রতিফলনও হয়তো এদের চেহারার খানিকটা পার্থক্য সৃষ্টি করে থাকবে। পূর্বদেশের জন্ম হয় ১৯৬৯ সালের অগস্ট মাসে।

ইত্তেফাক ও ঢাকা টাইমস

ইত্তেফাক গোড়া থেকেই আওয়ামি লীগের মুখপত্র। আওয়ামি লীগের নীতির ও কর্মসূচীর বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইত্তেফাকের আদর্শও পরিবর্তিত হয়েছে। জনবিরোধী লীগ ও সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে যেহেতু আপসহীন সংগ্রামে সর্বদা লিপ্ত ছিলো, সেহেতু পরোক্ষিত জনস্বার্থের পক্ষে ইত্তেফাক কাজ করেছে। অবশ্য ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে আওয়ামি লীগ যখন বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন হয়েছে, তখন ইত্তেফাকের ভূমিকা আওয়ামি লীগ সরকারের মতোই সম্পূর্ণরূপে জনস্বার্থের পরিপোষক হয়নি। যে ইত্তেফাক একদা ৫৪ সালের নির্বাচনের সময়ে পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির সমর্থনে সোচ্চার হয়েছে, সেই ইত্তেফাকই আবার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দির নীতিকে সমর্থন জানিয়েছে। অথবা ১৯৫৭ সালে কাগমারি সম্মেলনকে কেন্দ্র করে মাওলানা ভাসানীকে ভারতের দালাল আখ্যা দিয়েছে। যদিও ভাসানী-সোহরাওয়ার্দি মতান্তর সৃষ্টি হয় স্বায়ত্তশাসন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি নিয়েই।

তারপর আইয়ুব ও ইয়াহিয়াশাহীর আমলে, বিশেষ করে ১৯৬৫ সালের পর থেকে আওয়ামি লীগ যেমন পূর্ব বাংলার স্বশাসন ও ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটি নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করেছে, ইত্তেফাকও প্রবল উৎসাহ ও প্রভূত সৎসাহসের সঙ্গে তার সমর্থন করেছে।

স্বশাসনের দাবি ও আইয়ুববিরোধী ভূমিকার জন্যে সরকার ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেনকে গ্রেফতার করেন ১৯৬৬ সালের জুন মাসে। একই সময়ে ইত্তেফাকের নিউ নেশন প্রেস সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। ফলে ইত্তেফাক, ঢাকা টাইমস ও পূর্বাণী পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১২ জুলাই

ইত্তেফাক পুনরায় অন্য একটি প্রেস থেকে সংক্ষিপ্ত কলেবরে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সরকার নতুন ঘোষণাপত্র গ্রহণ না করায় ইত্তেফাক প্রায় তিন বছরের জন্যে বন্ধ হয়ে যায় ২৭ জুলাই।

বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়ে যাওয়ার পর ১৬ মারচ ইত্তেফাক আবার সরকারি রোষে পতিত হয়। এবার আর সম্পাদককে গ্রেফতার কিংবা প্রেস বাজেয়াপ্ত করা নয়, জঙ্গীশাহি এবার সোজাসুজি ট্যাঙ্ক নিয়ে আক্রমণ করে ইত্তেফাক অফিস। ট্যাঙ্ক দিয়ে একটি পত্রিকা অফিস উড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম।

তবে ইত্তেফাকের কতগুলি সীমাবদ্ধতা ছিলো। সমাজতন্ত্র নামক একটি জুজুর ভয়ে ইত্তেফাক সদাশঙ্কিত। বামপন্থী দলগুলির বিরুদ্ধে ইত্তেফাকের বিদ্বেষ ও বিষোদ্‌গার এজন্যে সহজেই চোখে পড়ে। ইত্তেফাক প্রকৃত অর্থে নবগঠিত ও উঠতি বাঙালি পুঁজিপতিদের পত্রিকা। কেননা, পশ্চিমা শোষকরা বাঙালি বিত্তবানদের বিরুদ্ধে যে-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো সে কথায় ইত্তেফাক যত উচ্চকণ্ঠ, বিত্তহীন সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্টে সে বোধ হয় তত বিচলিত নয়।

সংবাদ

বামপন্থী প্রগতিবাদের ছাপমারা পত্রিকা হিশেবে নিজেকে পরিচিত করতে আগ্রহী। অবশ্য তার পরিচালকরা যে নীতির প্রবক্তা তার প্রতি তাঁদের নিজেদের বিশ্বাস কতটা দৃঢ়মূল, অথবা তাঁদের বিশ্বাস ও কর্মে কতটা সঙ্গতি আছে, সে সম্বন্ধে পাঠকদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। সংবাদের এ কনট্রাডিকশন তার পরিচালনকার্যেও প্রতিফলিত। সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচারের উকিল, এ পত্রিকার কর্মীরা সবচেয়ে দুর্গত আর্থিক দিক দিয়ে। কৃষকের অভিযোগ ও অভাব অথবা ভিয়েতনাম এ পত্রিকার যতটা

স্লোগান ও ভঙ্গি, ততটা নীতি ও বিশ্বাস নয়। তদুপরি মসকো পিকিং-এর তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক লড়াই গণস্বার্থের সঙ্গে যেহেতু অঙ্গাঙ্গিভাবে কিংবা প্রত্যক্ষত জড়িত নয়, সে কারণে সংবাদের অনেকখানি উদ্যম অকারণে অপচিত হয়।

তথাপি পূর্ব বাংলার স্বশাসন, ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির সমর্থক হিশেবে সংবাদের নিশ্চয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে ইত্তেফাক ও সংবাদ যে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, তা অনুকরণযোগ্য এবং প্রশংসনীয়।

মরনিং নিউজ ও দৈনিক পাকিস্তান

মরনিং নিউজ প্রথম থেকেই বাংলা ও বাঙালিদের স্বার্থবিরোধী এবং মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকা। ১৯৪৮ সালে উরদুর পক্ষে এবং বাংলার বিরুদ্ধে এ পত্রিকা সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯৫২ সালেও সেই ভূমিকা গ্রহণ করতে গেলে, হঠকারিতার ফলস্বরূপ, এর অফিস জনগণ পুড়িয়ে দেন —আগেই সে কথা বলা হয়েছে। আইয়ুবের আমলে প্রেস ট্রাস্ট গঠিত হলে, এ পত্রিকাটি ট্রাস্টের অন্যান্য পত্রিকার মত আইয়ুবের সরকারি দলের মুখপত্ররূপে কাজ করতে আরম্ভ করে। পূর্ব বাংলায় এ পত্রিকাটির দোসর ছিলো দৈনিক পাকিস্তান—ট্রাস্টের বাংলা পত্রিকা। দৈনিক পাকিস্তানের সম্পাদক হলেন আজাদ পত্রিকার বহু বছরের ইসলাম ও সাম্প্রদায়িকতার সেবক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। আহসান হাবিব ও মাহফুজ উল্লাহ-এর মত রবীন্দ্রবিরোধী কবি হলেন এ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। এই গোটা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী মিলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের তথা বাংলার বিরুদ্ধে সোৎসাহে কাজ করতে থাকেন। মরনিং নিউজ ও দৈনিক পাকিস্তানের

জনবিরোধী ভূমিকা এত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ১৯৬৯ সালের জানুআরি মাসে জনতা প্রেসট্রাস্টের অফিস ও মুদ্রাযন্ত্র পুড়িয়ে ফেলে।

অগ্নিতে শুদ্ধ এ পত্রিকা অতঃপর জনমতকে ভয় করে চলেছে। গত নির্বাচনে এরা মোটামুটি নিরপেক্ষ ছিলো। হয়তো মুসলিম লীগের প্রতি পুরোনো আনুগত্য কখনো কখনো প্রকাশ পেয়ে থাকবে। এই জন্যেই বোধ হয় বর্তমানে টিক্কা খাঁর বিশ্বাস বর্তেছে এ পত্রিকা দুটির ওপর।

আজাদ

আকরাম খাঁর অতএব মুসলিম লীগের পত্রিকা আজাদ। যেহেতু ১৯৫৪ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত মুসলিম লীগ ক্ষমতাসীন ছিলো, সুতরাং সে ছিলো কার্যত সরকারি পত্রিকা। কিন্তু তার-পরেও দেখা গেল সরাসরি সরকারবিরোধী ভূমিকা নিতে সে অনিচ্ছুক। প্রকৃতপক্ষে এ পত্রিকাটি প্রধানত ক্ষমতাসীন দলের ক্রীড়নক হিশেবে নিজেকে ব্যবহার করতে দিয়েছে। ইসলাম ও শক্তিশালী পাকিস্তানে এর বিশ্বাস অবিচল। আইয়ুবের হাতে শাস্ত্রীয় ইসলাম বিপন্ন হওয়ায় এ পত্রিকাটি প্রথমবার সরকারের বিরুদ্ধে লিখতে শুরু করে।

পয়গাম

প্রভু আইয়ুবের প্রেসট্রাস্ট, ভৃত্য মোনেমের সম্বল পয়গাম। গুণ্ডা বলে পরিচিত পুত্রকে সম্পাদক করে পূর্ব বাংলার তদানীন্তন গভর্নর মোনেম খাঁ এ পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সাম্প্রদায়িকতা, আইয়ুবের অধীনে শক্তিশালী পাকিস্তান, মোনেম খাঁর মাসোহারা-

প্রাপ্ত গুণ্ডা ছাত্রবাহিনী এন এস এফ প্রভৃতি পোষণের বিষয় ছিল আলোচ্য পত্রিকাটির।

সংগ্রাম

উগ্র ধর্মান্ধ জামাতে ইসলামির মুখপত্র 'সংগ্রাম'। সংজ্ঞা জানা না থাকলেও সম্পূর্ণরূপে ইসলামি রাষ্ট্রগঠন জামাতে ইসলামির মতো এ পত্রিকারও লক্ষ্য এবং আদর্শ। বর্তমান জীবন ও সমাজের সমস্যার প্রতি উদাসীন এবং প্রগতির পরিবর্তে প্রতিক্রিয়ায় এ পত্রিকার বিশ্বাস। মানুষের পার্থিব জীবনের দুঃখকষ্টকে অবজ্ঞা করে কল্পিত পারলৌকিক মঙ্গলের কথা বলে এ গোষ্ঠী আসলে শোষকের পথকে প্রশস্ত করতেই ব্যস্ত। এ পত্রিকা ধর্মের নেশাগ্রস্ত কতিপয় লোককেই বিভ্রান্ত করতে পারে, জনজীবনের সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ নেই।

দি পিপল

পিপল পত্রিকার জন্ম হয়েছে মাত্র কয়েক মাস আগে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হিশেবে বলা যেতে পারে পিপল ইত্তেফাকেরই ইংরেজি সংস্করণ। ২৫ মার্চ রাত্রেই পত্রিকাটির অফিস পুড়িয়ে দেয় জঙ্গীবাহিনী। সম্প্রতি মুজিবনগর থেকে এ পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটি দাবি করেছে এর বিশ জন সাংবাদিক ২৫ মার্চ রাত্রে টিক্কা খাঁর ঘাতকবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন।

ঢাকা ছাড়া চট্টগ্রাম থেকে একাধিক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়; কিন্তু সামগ্রিকভাবে পূর্ব বাংলার জনমানসে এগুলির প্রভাব সামান্যই।

সাপ্তাহিক পত্রিকা

পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শহর থেকে অনেকগুলি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কোনো না কোনো রাজনৈতিক দল অথবা স্থানীয় বিত্তবান লোকের অর্থে পরিচালিত বলে এ পত্রিকাগুলি সে সব রাজনৈতিক দল অথবা ব্যক্তির স্বার্থকে সংরক্ষিত করতেই তৎপর, নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন এগুলির কাজ নয়। এ সমস্ত পত্রিকার মোট প্রচার সংখ্যাও অত্যন্ত নগণ্য এবং মানের দিক দিয়েও এগুলি নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর। এ কারণে এমন কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম করা শক্ত, জনমতগঠনে যার দান উল্লেখযোগ্য।

রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত কারণে একাধিক সাপ্তাহিক পত্রিকা অবশ্য ভিড়ের মধ্যে সহজে চোখে পড়ে। ভাসানীপন্থী ন্যাপের পত্রিকা হিশেবে 'জনতা' ও 'স্বাধিকার' বেশ পরিচিত। প্রচার সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে বেশি ৭ থেকে ১০ হাজার। 'গণশক্তি' পত্রিকাটি একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। এর সম্পাদক বদরুদ্দিন উমর তাঁর বিশেষ রাজনৈতিক আক্রম সত্ত্বেও, পূব বাংলার বোধ হয় সবচেয়ে সাহসী সংস্কৃতিসেবী ও প্রবন্ধলেখক। এঁর গ্রন্থ 'সাম্প্রদায়িকতা' 'সংস্কৃতির 'সংকট' 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা' ও 'পূব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' বক্তব্য ও ঐতিহাসিক কারণে তুলনাহীন। গণশক্তির রাজনৈতিক পরিচয়—এটি পূর্ব বাংলার চরম বামপন্থী দলের মুখপাত্র বর্তমান স্বাধীনতা সংগ্রামে অথবা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এর ভূমিকা একপ্রকার নেই বললেই চলে। প্রচার সংখ্যা প্রায় দশ হাজার।

সাময়িক পত্র

সংবাদপত্র জনমত গঠনের বোধ হয় সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার, এ বিষয়ে সাময়িক পত্রের গুরুত্বও অস্বীকার করা যায় না। 'সমকাল'

'পূর্বমেঘ' প্রভৃতি পত্রিকার পাঠক শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মানুষ এবং তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য, তথাপি পূর্ব বাংলার চিত্তজাগরণে এদের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য।

সমকাল

সমকাল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। সিকান্দার আবু জাফরের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৫৭ সাল থেকে। প্রকৃত পক্ষে এ পত্রিকাটি পূর্ব বাংলার এক সময়কার একমাত্র সাহিত্য পত্রিকা। যদিও অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে অথবা প্রকাশিত রচনাসমূহ সর্বদা যথেষ্ট উচ্চমানের হয়নি, তবু সমকালের একটা মান আগাগোড়া ছিলো। পূর্ব বাংলার আজকের খ্যাত অনেক সাহিত্যিকই প্রথমে সমকালে লিখেছেন। সরকার যখন ইসলামি সংস্কৃতির নামে উন্মত্ত, তখনো সমকাল ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতি সেবায় নিয়োজিত থেকেছে।

পূর্ব মেঘ

একাধিক কারণে 'পূর্ব মেঘ' সমকালের থেকে বেশি প্রশংসার অধিকারী। কেননা সমকাল প্রধানত সাহিত্যের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ ছিলো। এমনকি তার রচনাসমূহে সমাজচেতনা সুদূরপ্রসারী। পূর্ব মেঘে কেবল সমাজ বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হয়নি, তার সাহিত্যিক প্রবন্ধেও সমাজচেতনা অনেক বেশী স্পষ্ট। বদরুদ্দীন উমরের মতো লেখকের অধিকাংশ রচনা পূর্ব মেঘে প্রকাশিত হওয়ায় একদিকে পত্রিকাটি যেমন বিতর্কমূলক বলে পরিচিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি পাকিস্তানের ভিত্তিমূল সাম্প্রদায়িকতাকে আঘাত দিয়ে মুক্তিচিন্তার পথকে সে প্রশস্ত করেছে। বক্তব্যের চেয়েও

উমরের প্রবন্ধ সংসাহসের জন্যে অধিক শ্রদ্ধার দাবি করতে পারে। একদিন পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীরা যখন সরকারি নির্যাতনের ভয়ে স্বাধীন চিন্তাকে প্রকাশ করতে ভীত ছিলেন সে কালে উমর লেখেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পূর্বমেঘের নীতিও এই বলিষ্ঠতা ও সংসাহসের প্রমাণ দেয়। পূর্বমেঘের পাতায়ই প্রথম হাসান আজিজুল হকের ছোটো গল্প এবং সনৎ সাহার প্রবন্ধ প্রকাশ পায়।

রাজশাহি থেকে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও মুস্তাফা নূরুউল ইসলামের সম্পাদনায় ১৩৬৭ সাল থেকে পূর্বমেঘ প্রকাশিত হচ্ছে।

উত্তর অন্বেষা

সমকাল ও পূর্বমেঘ থেকে উত্তর অন্বেষা একটি কারণে স্বতন্ত্র। উত্তর অন্বেষা ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি সেবার সঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রচার করেছে এবং এ বিষয় প্রবল প্রতিকূলতার মুখে যথেষ্ট সংসাহস দেখিয়েছে। রচনার মানের জন্য যতটা নয় তার চেয়ে বক্তব্যের জন্যে উত্তর অন্বেষা অধিকতর উল্লেখযোগ্য। মযহারুল ইসলামের সম্পাদনায় রাজশাহি থেকে ১৯৬৭ সালে এ পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়।

কণ্ঠস্বর

'কণ্ঠস্বর এ্যাংগ্রি জেনারেশনের পত্রিকা। সাহিত্যসেবা এর উদ্দেশ্য যতটা, সমাজচেতনা ততটা মর্যাদা পায়নি। তবু ধর্ম-নিরপেক্ষতার জন্যে কণ্ঠস্বর প্রশংসার দাবি রাখে।

এ পত্রিকাগুলি ব্যতীত নানা সময়ে পূর্ব বাংলা থেকে বহু ক্ষণজীবী সাংস্কৃতিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। হয়তো সামগ্রিক-ভাবে তাদের অবদানও কম নয়। এ ছাড়া ঢাকা, রাজশাহি

চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান থেকে বিশেষত তরুণদের প্রচেষ্টায় কতগুলো অনিয়মিত সাহিত্য সংকলন প্রকাশিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই তরুণদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তথা প্রগতিবাদী সমাজের আদর্শ এ পত্রিকাগুলিতে প্রতিফলিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 'সাহিত্য পত্রিকা', রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 'সাহিত্যিকী', চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 'পাণ্ডুলিপি', বাংলা অ্যাকাডেমির 'বাংলা অ্যাকাডেমি পত্রিকা', কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোরডের 'বাংলা উন্নয়ন বোরড পত্রিকা' এবং নজরুল অ্যাকাডেমির 'নজরুল অ্যাকাডেমি পত্রিকা, গবেষণা পত্রিকা হিশেবে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। 'সাহিত্য পত্রিকার' মতো উচ্চমানের গবেষণা পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গেও বোধহয় দ্বিতীয়টি নেই। তবে এ পত্রিকাগুলির দান যতটা সাহিত্য ক্ষেত্রে, সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ততটা নয়।

বাংলা অ্যাকাডেমি

দ্রাবণের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে, অতিবিক্ত দ্রব্যকে তলানি হিশেবে পড়ে থাকতে হয়। কোনো সংবাদ শুনে মন আন্দোলিত হওয়ারও তেমনি একটা মাত্রা আছে, তারপর ভোঁতা মনে দুঃসংবাদ অথবা সুসংবাদ কোনোটাই তেমন সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় না। সীমান্তের ওপার থেকে আরো হাজারো দুঃসংবাদের মতো খবর এসেছে যে, সকল গণ-আন্দোলনের অনুপ্রেরণা ও শতস্মৃতিমাখা ঢাকার শহীদ মিনারটি ইয়াহিয়ার জঙ্গীবাহিনী ধ্বংস করেছে, ধ্বংস করেছে ভাষা আন্দোলনের অন্য আর একটি স্মৃতি বাংলা অ্যাকাডেমিকে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের দুটি অক্ষয় স্মৃতিকে এমন পাষণ্ডের মতো বিনষ্ট করার বর্বরতা ও নির্লজ্জতা দখলদারি সৈন্যরা দেখাতে পেরেছে অনায়াসে। আপন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য ইয়াহিয়াশাহি যে কোনো নীচতার আশ্রয় নিতে পারে। সুতরাং শহীদ মিনার এবং বাংলা অ্যাকাডেমি ধ্বংস করাটা সে পুরোনো ছকের মধ্যে পড়ে গেছে। এর মধ্যে নূতনত্ব যেটুকু সে কেবল সৈন্যদের বর্বরতা ও দুঃসাহস। বরং ধ্বংস না করলেই বোধ হয় তা পাকসৈন্যোচিত হতো না ; আমরা বিভ্রান্ত হতুম।

স্বাধীনতালাভের পর থেকেই পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ হিশেবে শাসন ও শোষণ করার জন্যে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ও তাঁর পারিষদবৃন্দ পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুর্বল যোগসূত্রকে সবল এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বহু শতাব্দীর দৃঢ় যোগসূত্রকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তথা বাংলা সংস্কৃতিকে

নির্মূল করার নানা সুচিন্তিত পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেছেন। পাকিস্তানের অধিকাংশ জনগণের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদাদানে অস্বীকৃত জানালে প্রথমে ১৯৪৮ ও পরে ১৯৫২ সালে ছুটি ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন সমগ্র পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার বাধ্য হলেন বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার সম্মান দিতে। ১৯৫৪ সালে জনগণের দাবির স্বীকৃতি স্বরূপ মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের সরকারি বাসভবন 'বর্ধমান হাউজে' স্থাপিত হয় বাংলা অ্যাকাডেমি আর মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে স্থাপিত হয় শহীদ মিনার। যদিও শহীদ স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্যে শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠিত হয়, তবু পরবর্তী-কালে এ মিনার শুধু ভাষা আন্দোলনে নিহতদের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকেনি, বরং প্রতীক হয়েছে সকল ন্যায্য আন্দোলনের। সকল আন্দোলনের কালেই শহীদ মিনার উদ্দীপনা জুগিয়েছে সংগ্রামী জনতার অন্তরে এবং শহীদদের স্মৃতি ক্রমে মর্মর মিনার থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে আপামর মানুষের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে। তাই আজ শহীদ মিনারকে ধূলিসাৎ করেও শহীদদের অক্ষয় স্মৃতিকে অথবা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসাকে মুছে ফেলা যাবে না।

শহীদ মিনারের মাধ্যমে যেমন শহীদদের স্মৃতিকে চিরজাগরূক করে রাখার চেষ্টা হয়েছে, তেমনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশের জন্যে স্থাপিত হয়েছিলো বাংলা অ্যাকাডেমি। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে, সরকারি সাহায্যে পরিচালিত হয়েছে বলে বাংলা অ্যাকাডেমি সর্বদা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা দেয়নি এবং ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির নামে অ্যাকাডেমি যে সব কর্মসূচী অনুসরণ করেছে তার মধ্যে পাকিস্তানের মৌল আদর্শেরই প্রতি-ফলন ঘটেছে।

তাই যদিও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সামগ্রিক উন্নয়ন বাংলা

অ্যাকাডেমির লক্ষ্য বলে কথিত হয়েছে, তথাপি দেখা যাবে, বাংলা অ্যাকাডেমি বাংলা সাহিত্য বলতে পূর্ব বাংলার সাহিত্যকে কিংবা বিভাগ পূর্ব বাংলার মুসলিম সাহিত্যিকদের রচিত সাহিত্যকে বুঝেছে। এর ফলস্বরূপ, অ্যাকাডেমি গবেষণাকার্য পরিচালনা করেছে মধ্য যুগের কিংবা উনবিংশ শতকের মুসলিম কবি-সাহিত্যি-কদের নিয়ে অথবা আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলে যার পৃষ্ঠপোষকতা অ্যাকাডেমি করেছে তা একান্তভাবেই পূর্ববঙ্গীয়। লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও গবেষণার যে কাজ অ্যাকাডেমি করেছে তা আপাতদৃষ্টিতে ধর্মীয় সংকীর্ণতামুক্ত মনে হলেও সূক্ষ্মবিচারে দেখা যাবে তার নীতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে আঞ্চলিকতা অথবা ধর্মীয় বিবেচনার দ্বারা।

কিন্তু এ সব সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, মধ্যযুগ নিয়ে যে ব্যাপক ও গুরুতর গবেষণার গোড়া-পত্তন অ্যাকাডেমি করেছে তার কোনো তুলনা পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে আদৌ থাকলেও বিরল। এনামুল হক, আহমদ শরীফ প্রমুখ পণ্ডিত মধ্যযুগ নিয়ে মৌলিক গবেষণা করেছেন বাংলা অ্যাকাডেমির পৃষ্ঠপোষকতায়। লোকসাহিত্য নিয়েও একাধিক পণ্ডিত নানা গবেষণাকার্যে লিপ্ত হয়েছেন। কেবল গবেষণাকর্মের পরিচালনা নয়, বহু গ্রন্থ ও বাংলা অ্যাকাডেমি নামক ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকার মাধ্যমে অ্যাকাডেমি এই সব গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছে। সৈয়দ সুলতান, গরীবুল্লাহ, শাহ সগীর, আলাওল, দৌলত কাজী প্রমুখ মুসলিম কবির গ্রন্থসমূহের মূল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রশংসনীয় কাজও বাংলা অ্যাকাডেমি সম্পন্ন করেছে। এতদ্‌ব্যতীত, লোকসাহিত্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বাংলা অ্যাকাডেমি একটি ক্ষুদ্র আরকাইভস্ স্থাপন করেছে। লোকসাহিত্য বিষয়ক যে গ্রন্থগুলি অ্যাকাডেমি প্রকাশ করেছে সেগুলিও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

বিভাগপূর্ব অপেক্ষাকৃত আধুনিক মুসলিম সাহিত্যিকদের নিয়েও

বাংলা অ্যাকাডেমির উৎসাহ লক্ষণীয়। মাশহাদী, শেখ আবদুর রহিম, মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, ফজলুল করীম, মতীয়ুর রহমান, বেগম রোকেয়া, নুরুননেসা, কাজী নজরুল ইসলাম, কায়কোবাদ, শাহাদত হোসেন প্রভৃতি কবিসাহিত্যিকের রচনার পুনরুদ্ধার ও পুনর্মূল্যায়ন বাংলা অ্যাকাডেমির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এই সব লেখকের রচনাবলী পুনঃপ্রকাশ করে এবং এঁদের সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যাদি সংবলিত গ্রন্থাদি প্রকাশ করে অ্যাকাডেমি তার দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছে। অ্যাকাডেমি কর্তৃকলুপ্তপ্রায় রচনাবলীর পুনঃপ্রকাশ ও পুনর্মূল্যায়ন প্রয়াস যেমন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, তেমনি সাহিত্য বিষয়ে যে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব এই প্রয়াসে অনায়াসে লক্ষণীয় তা সমান নিন্দনীয়।

তবে অ্যাকাডেমি-পরিচালকদের এই মনোভাবের কারণ আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। একদিকে অ্যাকাডেমির ওপর সর-কারি চাপ যেমন বর্তমান ছিলো, তেমনি অন্যদিকে একটি হীনমন্যতা তার মধ্যে ছিলো সুস্পষ্ট। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের একটা বড়ো অবদান স্বীকৃত হয়েছে। লোকসাহিত্যেও মুসলিম ঐতিহ্যকে অবহেলা করা যায় না। কিন্তু সমাজ-অর্থনৈতিক কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অংশ গ্রহণ অত্যন্ত সীমিত। সুতরাং স্বাধীনতা-উত্তর কালে একটি ইসলামি রাষ্ট্রের নায়করা যদি অদূর অতীতের দৈন্যকে ঢাকবার জন্যে প্রাচীন অতীতের দিকে সাগ্রহে হাত বাড়ান তা হলে সঙ্গত হোক অসঙ্গত হোক সেটা অন্তত স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হতে পারে। তাই বাংলা অ্যাকাডেমির পরি-কল্পনাসমূহে একটি হীনমন্যতা ও এই পেছনে-ফিরে তাকানোর মানসিকতা লক্ষ্যযোগ্য। দৃষ্টির এই অনাধুনিকতাকে মেনে নিলে বাংলা অ্যাকাডেমির কার্যকলাপের মূল্য ও উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। এবং তেমন অবস্থাতে বলা যায়, পূর্ব বাংলার

ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে বাংলা অ্যাকাডেমি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

অ্যাকাডেমি ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের নিমিত্ত যে কর্মসূচী নিয়েছিলো তাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা চলে ঃ

১. প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ঃ বাংলা অ্যাকাডেমি বহু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ করেছে। এ সমস্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে আছে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, আরবি-ফারসি ও বাংলা গ্রন্থাদি। পরাগলী মহাভারত, আলাওল ও দৌলতকাজীর মূল পাণ্ডুলিপি এ সংগ্রহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক। (বাংলা দেশের বর্তমান সংগ্রামে এ পাণ্ডুলিপিগুলো নাকি অন্যান্য সব জিনিশের সঙ্গে বিনষ্ট হয়েছে।) পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে মধ্য যুগীয় কয়েকখানি গ্রন্থ সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

২. লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ঃ লোকসাহিত্যের লুপ্ত-প্রায় নিদর্শনসমূহ উদ্ধার করে সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে অ্যাকাডেমি। শব্দধারক যন্ত্র ও অন্যান্য উপায়ে, এই সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসাহিত্যের ওপর কয়েকটি গ্রন্থও অ্যাকাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

৩. রচনাবলী প্রকাশ ঃ যে সমস্ত মুসলিম কবি সাহিতিকদের রচনাবলী দুষ্প্রাপ্য ও প্রায় বিস্মৃত, সেগুলো প্রকাশের একটি বৃহৎ পরিকল্পনা অ্যাকাডেমি গ্রহণ করেছে। এ পর্যন্ত আলাওল, শেখ আবদুর রহিম, মীর মশাররফ হোসেন, মতীয়ুর রহমান, ইয়াকুব আলি, নুরুননেসা, বেগম রোকেয়া প্রমুখের রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

৪. সৃষ্টিধর্মী রচনার প্রকাশ ঃ পূর্ব বাংলার সাহিত্যিকদের সৃষ্টিধর্মী রচনা বিশেষত নাটক প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়ে অ্যাকাডেমি এ যাবৎ অনেকগুলো গ্রন্থ প্রকাশ করেছে।

৫. মৌলিক গবেষণামূলক রচনার প্রকাশ: মূল্যবান গবেষণা-মূলক বহু সংখ্যক রচনা অ্যাকাডেমি এ পর্যন্ত প্রকাশ করেছে।

৬. জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ: বিশেষত ইসলামি নীতির দিকে লক্ষ্য রেখে অ্যাকাডেমি বেশি কিছু সংখ্যক জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেছে। 'জিন্নাহনামা' থেকে শুরু করে 'নজরুলজীবনের শেষ অধ্যায়' পর্যন্ত অনেকগুলো ভালোমন্দ গ্রন্থ এ পরিকল্পনার অধীনে প্রকাশিত হয়েছে।

৭. অনুবাদকর্ম: শ্রেষ্ঠ বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদের দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করার জন্যে অ্যাকাডেমি প্রত্যক্ষভাবে একটি অনুবাদ বিভাগ পরিচালনা করেছে এবং গ্রন্থ প্রকাশ করে পরোক্ষভাবে অনুবাদকদের উৎসাহিত করেছে। তা ছাড়া বাংলা সাহিত্য অনুবাদের মাধ্যমে বিদেশীদের নিকট তুলে ধরার চেষ্টাও অ্যাকাডেমি করেছে। নজরুলের কিছু কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

৮. গবেষণাবৃত্তি দান: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করার জন্যে অ্যাকাডেমি প্রতি বছর কয়েকটি করে গবেষণাবৃত্তি দিয়েছে। এই বৃত্তি নিয়ে ইতিমধ্যে কয়েকজন ডকটরেট ডিগ্রিও লাভ করেছেন।

৯. সাহিত্য পুরস্কার দান: গবেষণাকর্ম, কাব্য, নাটক, ছোটোগল্প, উপন্যাস ও কিশোর সাহিত্যের জন্যে বাংলা অ্যাকাডেমি প্রতি বছর এক-একটি খাতে দু' হাজার টাকার এক-একটি সাহিত্য পুরস্কার দিয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এ পুরস্কার ও সম্মান সাহিত্য-সেবীদের পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করে।

১০. সাংস্কৃতিক কর্মসূচী: সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাংলা অ্যাকাডেমি নিয়মিত পালন করে আসছে। ২১ ফেব্রুআরি, রবীন্দ্র-ইকবাল-নজরুল জন্মোৎসব প্রভৃতি উপলক্ষে অনেক সময়ে সিমপোসিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিমপোসিয়ামে

পঠিত প্রবন্ধ-সমূহ পরে অ্যাকাডেমি পত্রিকায় অথবা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য আইয়ুবের শাসনকালে বিপ্লব দিবস এবং উজ্জ্বল দশকও অ্যাকাডেমি সোৎসাহে পালন করেছে, তবে তার কারণ অস্পষ্ট নয়।

সরকারি নিয়ন্ত্রণে এনামূল হক, সৈয়দ আলী আহসান, কাজী দীন মহম্মদ ও কবীর চৌধুরী বাংলা অ্যাকাডেমি পরিচালনা করেছেন। ইসলাম ও সাম্প্রদায়িকভাব প্রতি এঁদের ব্যক্তিগত আনুগত্য কতখানি সে প্রশ্ন অবান্তর, কিন্তু পাকিস্তানের তথাকথিত দ্বিজাতিতত্ত্বের মৌল আদর্শ এই প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এই জন্যে দেখতে পাই আধুনিক গদ্য ও আধুনিক পদ্য সংগ্রহ নামে যে সংকলন দুটি অ্যাকাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে, নামটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও, তা বস্তুত বাঙালি মুসলমানদের রচনা সংগ্রহ। এছাড়া কয়েক বছর আগে অ্যাকাডেমি একটি আদর্শ বাংলা অভিধান প্রণয়নের পরিকল্পনা করেন। এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিলো আরবি-ফারসি শব্দবহুল একটি মুসলমানি বাংলা ভাষার আদর্শ রচনা করা। অ্যাকাডেমির কর্মকতারা দায়িত্বসম্পন্ন দালালের মতো সে কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। অতি সাম্প্রতিককালে জীবনানন্দকে নিয়ে কাজ করার জন্যে একটি গবেষণাবৃত্তি দান করা হয়েছে বটে, কিন্তু এ যাবৎ অ্যাকাডেমির সকল গবেষণা মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ ছিলো। এমনকি, কাজী দীন মহম্মদের মতো সাম্প্রদায়িক পরিচালকের কাছে রবীন্দ্রনাথও স্বীকৃতি লাভ করেননি। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বাংলা অ্যাকাডেমি তিন শতাধিক গ্রন্থ এ যাবৎ প্রকাশ করে থাকলেও, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত কোনো গ্রন্থ নেই। যেহেতু বাংলা সন সংক্ষেপে অবৈজ্ঞানিক, অ্যাকাডেমি তাই একটি সংস্কৃত বঙ্গাব্দ প্রণয়ন ও প্রচলন করেছে। আপাতদৃষ্টিতে কাজটি

প্রশংসনীয় বলে বিবেচিত হলেও একটু ভেতরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে হিন্দু বঙ্গাব্দকে মুছে ফেলে একটা নতুন কিছু করার পরিকল্পনা থেকে এ উদ্যমের জন্ম। উপরন্তু কাজী দীন মহম্মদের পরিচালনায় যে সনটি প্রবর্তিত হয়, তা জুলীয়ান ক্যালেনডারের মতো সমান ত্রুটিপূর্ণ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সরাসরি কোনো যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও ইসলাম ও জাতীয় সংহতির প্রতি দৃষ্টি রেখে ইসলামধর্ম-বিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থ এবং ধর্মীয় ও জাতীয় নেতাদের কতোগুলি জীবনীগ্রন্থ বাংলা অ্যাকাডেমি প্রকাশ করেছে। তা ছাড়া, অ্যাকাডেমির প্রায় সবগুলি পরি-কল্পনাই আধুনিক সমস্যা ও সংঘাতপূর্ণ জীবনের প্রতি বিমুখ। অ্যাকাডেমির স্বল্পসংখ্যক কাজই, এ কারণে, উপযোগিতার মাপে মূল্যবান বলে স্বীকৃত হতে পারে।

কিন্তু এসকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অ্যাকাডেমি এমন কিছু গ্রন্থ প্রকাশ করেছে অথবা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে এমন কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা দান করেছে, যা অবশ্যই উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। মুহম্মদ শাহীদুল্লাহর সম্পাদনায় যে আঞ্চলিক ভাষার কেন্দ্রীয় অভিধান প্রকাশিত হয়েছে, তা যেমন অভিনব তেমনি প্রশংসনীয়। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড স্থাপনের আগে অ্যাকাডেমি কিছু পরি-ভাষাও রচনা করেছে। তা ছাড়া শহীদুল্লাহ প্রণীত 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' এবং মুহম্মদ আবদুল হাই প্রণীত 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' বাংলা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক সকল গ্রন্থের মধ্যে একটি বিশিষ্ট আসনের দাবি করতে পারে। 'সিমপোসিয়াম' 'প্লেটোর সংলাপ', 'জরাথস্ত্র বললেন', হানটারের 'দি ইনডিয়ান মুসলমানস', হিট্টির 'আরব জাতির ইতিহাস' প্রভৃতি অনুবাদকর্ম দর্শন ও ইতিহাস বিষয়ক প্রকাশনার নমুনা বলে বিবেচিত হতে পারে। আনি-সুজ্জামানের 'মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র', মুনীর চৌধুরীর 'মীর মানস' মুহম্মদ সিদ্দিক খানের 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা'

রফিকুল ইসলামের 'নজরুল নির্দেশিকা', সুফী জুলফিকার হায়দারের 'নজরুলে জীবনের শেষ অধ্যায়' প্রভৃতি গ্রন্থ নিঃসন্দেহে তথ্য-মূলক এবং সকল সাহিত্যামোদী ও গবেষকের কাছে মূল্যবান বলে সমাদব লাভ করবে।

অতি সাম্প্রতিককালে বাংলা অ্যাকাডেমি পূর্ব বাংলার চিত্ত-জাগরণের প্রতি ক্রমশ মনোযোগী হচ্ছিলো। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে তার কার্যকলাপের মধ্যে সে স্বাক্ষব পরিস্ফুট হতো ; কিন্তু ইয়াহিয়া অত্যন্ত হু শিয়াব, অঙ্কুরে বিনষ্ট করাব প্রবচন তিনি ভালো করে জানেন। বাঙালিদেব গর্ব ও আশার একটি প্রতিষ্ঠান তাই এভাবে ধূলিসাৎ হলো।

পূর্ব বাংলার শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ

দুর্বল ভিত্তির ওপর দণ্ডায়মান সুউচ্চ মিনারের পতন শুধু সময়সাপেক্ষ। চারিদিক থেকে টানা দিয়ে তার অস্তিত্বকে চিরস্থায়ী করার প্রচেষ্টা করতে পারেন গম্বুজনির্মাতা ; কিন্তু পরিণতি তাতে অপরিবর্তিত থাকে। একথা পুনর্বার প্রমাণিত হয়েছে পাকিস্তানের ইতিহাস থেকে। জাতীয়তার একটি মিথ্যা সংজ্ঞার ওপর নির্ভর করে একদা পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিলো। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ অথবা লিয়াকত আলী খান, মুখে যাই বলুন, ভালো করে জানতেন ধর্ম জাতীয়তার একমাত্র শর্ত নয়, সর্বপ্রধান শর্ততো নয়ই ; অথচ পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের বাস্তবিক ঐক্যসূত্রতো ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু নয়! এই মিথ্যা মিলনকে অমর করার জন্যে দূরদর্শী নেতারা স্বধর্মপ্রীতি, আরো স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় স্বধর্মান্ধতা ও পরধর্মের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণাবোধ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন— বিশেষ করে পূর্ব বাংলার লোকদের মধ্যে। সরকারি নীতিকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানে গঠিত হয়েছিলো অনেকগুলি কার্যকর প্রচারযন্ত্র। চতুর ফন্দিবাজরা বুঝেছিলেন, বুড়ো ঘোড়াকে নতুন কিছু শেখানো শক্ত, সুতরাং বর্তমান জেনারেশনকে ইসলামের ডুগডুগি বাজিয়ে তাঁরা নাচতে চেয়েছিলেন, আর সাম্প্রদায়িক শিক্ষাকে মিশিয়ে দেওয়ার জন্যে নির্বাচন করেছিলেন ভাবী প্রজন্মকে।

ভাবের অবাধ চলাচল যেখানে নিষিদ্ধ, শিক্ষাকে সেসব দেশে ছেঁটে-কেটে বিশেষ আকৃতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় বিতরণ করা হয়

শিশুদের মধ্যে। এ শিক্ষা লাভ করে যে যুবক বা যুবতী বেরিয়ে আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী থেকে, সে কথা বলে তোতা পাখির মতো এবং শেখানো রীতিতে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, শত্রুমিত্র বিচার করে, এককথায় স্বাধীন চিন্তা করার ক্ষমতাকে চিরকালের জন্যে পঙ্গু করে তাকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলা হয় একটি কৃত্রিম মূল্যবোধের প্রতি। দ্বিজাতিতত্ত্বকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অঙ্গীভূত করার উদ্দেশ্য নিয়েই পাকিস্তানের নেতারা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এমন একটি শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, যা পাকি-স্তানের উভয়াংশের ঠুনকো যোগসূত্রকে দৃঢ় করতে সমর্থ হবে। এই কারণে, মুক্ত চিন্তার বদলে ছাত্রদের তাঁরা দিতে চাইলেন ধর্মীয় সংকীর্ণ শিক্ষা যা তরুণদের যুগপৎ ইসলামের প্রতি মোহাচ্ছন্ন এবং হিন্দু-ভারতের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তুলবে।

একদেশদর্শী শিক্ষানীতিকে ব্যাপ্ত করে দেওয়ার জন্যে প্রথমে সরকার সবগুলি পাঠক্রম নির্ধারক সংস্থার ওপর আপন কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। দেশের সাহিত্যের নামে মুসলিম সাহিত্যিকদের পাঠ্য-অপাঠ্য রচনাকে নির্বিচারে উপস্থাপিত করা হলো ছাত্রদের সামনে আর দেশের ইতিহাসের নামে শেখানো হলো আরব-ইরান এবং মুসলিম লীগের ইতিহাস। বালকবালিকারা জানলো স্থলতান মাহমুদ বীর সৈনিক : মহম্মদ ঘোরি মহান মুসলিম স্থলতান, পৃথ্বিরাজ কাপুরুষ হিন্দু রাজা ; ঔরঙ্গজীব দেশপ্রেমিক, শিবাজী দেশদ্রোহী ; স্থরেন ব্যানার্জি, গোখলে, বিপিন পাল, গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন, স্থভাষচন্দ্র, জওহরলাল মুসলিম স্বার্থবিরোধী কূট রাজনী-তীক, সৈয়দ আহমদ, আবদুল লতীফ, সলিমুল্লাহ, জিন্নাহ, লিয়াকত আলী উদার স্বাধীনতাসংগ্রামী।

কিন্তু যেহেতু শুধুমাত্র পাঠক্রম নির্ধারণ করেই শিক্ষাকে উদ্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করা যায় না, তার জন্যে প্রয়োজন সে শিক্ষার অনুকূল পাঠ্যপুস্তক, সে কারণেই অতঃপর আইয়ুব খাঁর আমলে

একটি টেকস্ট-বুক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রচিত হয়েছে এক-এক শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে একখানি মাত্র পাঠ্যপুস্তক। আর সে পুস্তকে সত্যের চেয়ে বেশি খাতির পেয়েছে সরকারি বক্তব্য। পাকিস্তান যে মিথ্যার ওপর নির্মিত, তাকে সত্যের চেহারা দিতে এই সকল গ্রন্থে শত মিথ্যার প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত কতিপয় তথাকথিত শিক্ষিত লোক এই পাঠ্যপুস্তকগুলিব নীতি নির্ধারণ করেছেন এবং সেগুলি রচনা করেছেন। স্বার্থান্ধ এই অসাধু বুদ্ধিজীবীরা আদর্শ এবং সত্যাকে বিসর্জন দিয়েছেন সবকারি প্রলোভন ও ক্ষুদ্র আর্থিক লাভের মুখে।

কর্তৃপক্ষ যখন দেখলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে তাঁরা কিছুতেই বর্জন করতে পাববেন না, তখন সূক্ষ্মতার পথে তাকে খর্ব করতে উদ্যত হলেন। বিভাগপূর্ব বাংলা সাহিত্য থেকে সকল হিন্দু নামকে ধুয়ে ফেলে তাকে একটা ইসলামি রূপ দেওয়ার চেষ্টা চললো। এই কারণে পূর্ব বাংলার স্কুলপাঠ্য সাহিত্য সংকলনগুলি বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করে না। এই গ্রন্থগুলিতে নির্বাচিত কবিলেখকদের প্রতিষ্ঠা যেমন প্রশ্নাতীত নয়, তেমনি রচনাগুলিও দাবি করতে পারে না অবিসংবাদিত উৎকর্ষ বা প্রশংসা। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে বাংলা সাহিত্যের নাম করে পূর্ব বাংলার ছেলেরা পড়ে মীর মশাররফ হোসেন, শেখ ফজলুল করিম, মোজাম্মেল হক, কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তাফা, জসীম উদ্দীন, বন্দে আলী মিয়া, ফররুখ আহমদ, হাবীবুর রহমান, আহসান হাবীব প্রমুখের রচনা। রবীন্দ্রনাথ নামক একজন অবাঞ্ছিত লোকের কথাও তারা শোনে অথবা হয়তো জীবনানন্দও কখনো চকিতে তাদের সামনে উপস্থিত হন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যে একপ্রকার অপরিচিত থাকে তাদের কাছে।

বাংলা সাহিত্যের মতো স্বাধীনতাসংগ্রামের যে ইতিহাস

শেখানো হয় অপরিণত শিশুদের, তা একান্তভাবে বিকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট। সে ইতিহাস পাঠে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে মুসলমানদের স্বাধীনতার সবচেয়ে দুর্লঙ্ঘ প্রতিবন্ধক ছিলেন হিন্দুরা এবং সংগ্রামবিক্ষত মহান নেতা জিন্নাহ সাহেব তাঁদেরই কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত ছিনিয়ে এনেছেন দুর্লভ আজাদি। গান্ধীজী-নেতাজী-নেহরুর নাম প্রায় সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত পূর্ব বাংলার ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট—অন্তত টেকস্ট-বুক কমিটির গ্রন্থে এঁরা প্রায় অনুপস্থিত এবং স্বাধীনতাসংগ্রামে এঁদের দান প্রায় অস্বীকৃত।

এই টেকস্ট-বুক কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষালাভ করে যে ছাত্র উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তার পক্ষে মুক্তচিন্তার শরিক হওয়া প্রায় অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসে এই ছাত্রদের তাই খটকা লাগে। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলি কমিটির রচনা নয়, এমন কি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম নির্ধারক সংস্থার ওপরও সরকারি প্রভাব উচ্চ বিদ্যালয় পর্যায়ের মতো অত প্রবল নয়। কিন্তু অনেক তরুণই নতুন মতামতের সঙ্গে মীমাংসা করতে পারে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপককে তারা এ কারণে বিবেচনা করে জাতীয়তাবিরোধী বলে। পাঠ্যপুস্তকের প্রতিও তাদের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা গুপ্ত থাকে না। তবে কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী মিথ্যা শিক্ষার শিকল কেটে বেরিয়ে আসে মুক্তবুদ্ধির উন্মুক্ত প্রান্তরে।

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থার শিকার হওয়া সত্ত্বেও, পূর্ব বাংলায় কী করে এমন ব্যাপক চিত্তজাগরণ সম্ভব হলো, সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। হয়তো শত মিথ্যা দিয়েও শেষ পর্যন্ত শেষরক্ষা হয় না বলেই সত্য প্রকাশিত হয়েছে তার স্বাভাবিক রীতিতে এবং পূর্ব বাংলাও সেই পথে সরকারি ষড়যন্ত্রের নাগপাশ ছিন্ন করতে সমর্থ হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড

পূর্ব বাংলার তীব্র ভাষা আন্দোলনের মুখে, প্রসন্ন মনে না হলেও, পাকিস্তান সরকার অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিশেবে বাংলার দাবিকে মেনে নিতে বাধ্য হন। ১৯৫৬ সালে গৃহীত পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে এ দাবি স্বীকৃত হয়। ১৯৬২ সালে তৎকালীন একনায়ক আইয়ুব খাঁর নির্দেশে তথাকথিত জাতীয় পরিষদের কর্তাভজা সদস্যবৃন্দ যে শাসনতন্ত্র রচনা করেন, তাতেও বাংলার দাবি গৃহীত হয়। এই শাসনতন্ত্রে বলা হয়, বাংলা ও উর্দু সকল শিক্ষা ও সরকারি কাজের বাহন হিশেবে ব্যবহৃত হবে। তবে তার পূর্বে এ ভাষাদ্বয়কে ব্যবহারোপযোগী করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিতে হবে। ১৯৭২ সালে জাতীয় পরিষদ বিবেচনা করেন ইংরেজির পরিবর্তে আলোচ্য ভাষাদ্বয়কে সকল কাজে ব্যবহার করা যায় কি না। ভাষাকে গড়ে তোলার সরকারি নির্দেশ কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে একটি উর্দু বোর্ড এবং পূর্ব বাংলায় একটি কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড স্থাপিত হয় ১৯৬২ সালের পর। এর আগে থেকে অবশ্য করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ট্রান্সলেশন ব্যুরো' ও ঢাকার বাংলা অ্যাকাডেমি উর্দু ও বাংলা পরিভাষা নির্মাণ ও টেকস্ট-বুক রচনার কাজে হাত দিয়েছিলো। এ ছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরো দু একটি প্রতিষ্ঠান এ কাজে ব্রতী হয়েছিলো। সহযোগিতার মাধ্যমে এ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের সমন্বয় করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিলো। তা ছাড়া উপযুক্ত সরকারি অর্থ সাহায্যপুষ্ট একটি

কেন্দ্রীয় সংস্থার পরিচালনায় পরিভাষা ও টেকস্ট-বুক রচিত না হলে অসঙ্গতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল পুরোপুরি। এ দিকে দৃষ্টি রেখেই কেন্দ্রীয় সরকার পূব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্বোক্ত স্বতন্ত্র ও স্বশাসিত বোর্ড দুটি গঠন করেন।

বাংলা অ্যাকাডেমি থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন আপাতবিচারে বাহুল্য বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু বাংলা অ্যাকাডেমির সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের একটি মৌল পার্থক্য আছে। বাংলা অ্যাকাডেমি ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচিহ্ন—এর লক্ষ্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ও গবেষণা। অপর পক্ষে, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড-এর লক্ষ্য হলো বাংলা ভাষাকে শিক্ষার ও সরকারি কাজের বাহন হিশেবে গড়ে তোলা। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে, উভয় প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ জল-অচল দেয়াল দিয়ে আলাদা করা যাবে না। বাংলা অ্যাকাডেমি যেমন মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' অথবা মুহম্মদ আবদুল হাই-এর 'ধ্বনিতত্ত্ব ও বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান' গ্রন্থ প্রকাশ ও কিছু সংখ্যক পরিভাষা নির্মাণ করেছে, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড তেমনই অনেকগুলো সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে।

বাংলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বেশ কয়েক বছর আগেই স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিশেবে গ্রহণ করছে। তা ছাড়া স্নাতকোত্তর পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর বাংলায় লেখাও ঐচ্ছিক করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেলো স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতকসম্মান শ্রেণীতে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার্থীরা অনেকেই বাংলায় উত্তর লিখছেন না, বিশেষত বিজ্ঞান বিষয়ে। এর জন্যে দায়ী প্রধানত টেকস্ট-বুকের অভাব এবং বাংলায় শিক্ষাদানের ব্যাপারে শিক্ষকদের অপটুতা ও আন্তরিকতার অসদ্ভাব। পরিভাষা ও পণ্ডিতজনের বাংলা লেখার অনুৎসাহ আবার টেকস্ট-বুক রচনার

প্রতিবন্ধক।

পরিভাষা তৈরির জন্যে পণ্ডিতজনদের নিয়ে বাংলা উন্নয়ন বোর্ড অনেকগুলো কমিটি গঠন করেন। তত্ত্বমূলক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান এবং কলা ও সমাজ-বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থাদি রচনার কাজও এমনি পণ্ডিতদের ওপর অর্পিত হয়। লেখকদের যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক দান ও গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে বোর্ড এই পরিকল্পনাকে যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হন। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পরিভাষা ছাড়াও অর্থনীতি, বাণিজ্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের পরিভাষা রচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে এ বিষয়সমূহের ওপর অনেকগুলো টেকসট-বুকও প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞানবিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর জন্যে এ যাবৎ যে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে, তার সবগুলি প্রামাণ্য না হলেও কয়েকটি গ্রন্থ সকল মানদণ্ডের বিচারে মূল্যবান ও শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে। রসায়নবিষয়ে কুদরত-ই খুদা অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তার মধ্যে চার খণ্ডে সমাপ্ত 'জৈব রসায়ন' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। আবদুল জব্বারের একাধিক খণ্ড 'খগোল পরিচয়' আর একটি প্রশংসনীয় গ্রন্থ। আলি মুহম্মদ ইউনুস রচিত ভ্রূণতত্ত্ব বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা ও ভাষার উৎকর্ষে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। এখানে গোলাম সামাদের 'নৃতত্ত্ব' টেকস্ট-বুক নয়, কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের ওপর এমন তথ্যমূলক রচনা বাংলা ভাষায় বেশি নেই। বোর্ড-র অনেকগুলি গ্রন্থ বর্তমানে প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। সবগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হলে, স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত বাংলাকে শিক্ষার বাহন করা নিঃসন্দেহে সম্ভব হবে।

কেবল টেকস্ট-বুক প্রণয়ন ও পরিভাষা রচনার কাজই নয়, বাংলা সাহিত্যবিষয়ক বহু গ্রন্থও বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রকাশ করেছে। চার খণ্ডে 'নজরুলরচনাবলী' প্রকাশের যে পরিকল্পনা

বোর্ড গ্রহণ করেছে, তার তিনটি খণ্ড এ যাবৎ প্রকাশিত হয়েছে। কাজী এমদাদুল হক, ইসমাইল হোসেন শিরাজী প্রমুখ মুসলিম সাহিত্যিকের রচনা পুনঃপ্রকাশের দায়িত্বও বোর্ড গ্রহণ করেছে। সেই সঙ্গে মুসলিম সাহিত্যসাধক চরিতমালা প্রণয়নের কাজও বোর্ড আংশিকভাবে সম্পন্ন করেছে। তবে শুধুমাত্র মুসলিম সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বোর্ডের উৎসাহের কারণ বাংলা অ্যাকাডেমির অনুরূপ। বাঙালি মুসলমানদের একটা হীনমন্যতা ও অদূর অতীতের তিক্ততার লজ্জা ঢাকার প্রয়াসই এর মধ্যে লক্ষ্যযোগ্য। এই প্রয়াসের অন্যতম ফসল ইসলাম ধর্মবিষয়ক গ্রন্থাদি। যদিও হাদিসশরীফ অথবা চার খলিফার জীবনী কোনোক্রমেই বাংলা ভাষার উন্নতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, তথাপি পাকিস্তান সরকারের ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিশেবে ব্যবহার করার নীতির সমর্থনেই বাংলা উন্নয়ন বোর্ড-এ জাতীয় গ্রন্থাদি প্রকাশ করেছে। লোকসাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থাদি প্রকাশের মধ্যেও কমবেশি এই মানসিকতাই লক্ষণীয়।

বাংলা সাহিত্যবিষয়ক গবেষণাকার্যে উৎসাহ দান করার জন্যে উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অর্থসাহায্য করে থাকে। ঢাকা রাজশাহি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগগুলি যথাক্রমে 'সাহিত্যপত্রিকা', 'সাহিত্যিকী' ও 'পাণ্ডুলিপি' নামক তিনটি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করে। এগুলি উন্নয়ন বোর্ড-এর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়। তদুপরি বাংলা বিভাগগুলি কোনো গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করতে চাইলেও, বোর্ড-এর আনুকূল্য লাভ করে। কতকগুলি সাহিত্যপত্রিকা ও কিশোর-সাময়িকী প্রকাশের ব্যাপারেও বোর্ড অর্থসাহায্য দান করে। বোর্ড নিজেও 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকা' নামে একটি ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করে। অবশ্য গবেষণার সঙ্গে ইসলামিক বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতাও এ পত্রিকায় লক্ষ্য করা যায়।

কার্যকলাপে পাকিস্তান সরকারের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক নীতি বিভিন্ন সময়ে স্পষ্ট হলেও, এ কথা অনস্বীকার্য যে, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা ভাষাকে সকল শিক্ষার ও সরকারি কাজের বাহন করার জন্যে যে বৃহৎ প্রকল্প হাতে নিয়েছে, তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবেন বাঙালিরা। সরকারি ভেদনীতি, এনামুল হকের উদার পাণ্ডিত্য এবং আশরাফ সিদ্দিকীর সংকীর্ণতা হয়তো বোর্ড-এর কার্যসূচীকে নানা সময়ে নানা খাতে প্রবাহিত করেছে, তথাপি বলা যায়, বাংলা ভাষাকে ব্যবহারোপযোগী করে তোলার ব্যাপারে বোর্ড-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

ছায়ানট

পূর্ব বাংলায় বর্তমানে একটি অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ রচিত হয়েছে বলে আমরা অনেক সময়েই দাবি করি এবং গর্বিত হই। কোনো একজন মানুষ অথবা একটি প্রতিষ্ঠানের নয় বরং বহুজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির এ রূপান্তর ঘটাতে পেরেছে। সরকারি প্রতিকূলতা কী করে একটি মহৎ কাজে অন্যথায় নিষ্ক্রিয় মানুষকে সকর্মক করে তুলতে পারে, তার চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসবকে কেন্দ্র করে। বাঙালি সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা তখনো যথেষ্ট ছিলেন না পূর্ব বাংলায়। তবু অনেকেই ছিলেন। এরা শতবার্ষিকীর কিছুকাল আগে ঠিক করেন যে, সাড়ম্বরে তারা শতবর্ষ পূর্তি উৎসব পালন করবেন রাজধানী ঢাকাতে। জাস্টিস মুরশেদ, প্রেস ক্লাব ও বেগম সুফিয়া কামালের নামে এরা তিনটি কমিটি গঠন করেন। এই তিনটি কমিটি একযোগে কিন্তু আলাদা আলাদা নামে এগারো দিন ধরে এই উৎসব পালন করেন। পঁচিশে বৈশাখের অনুষ্ঠানটি হয় জাস্টিস মুরশেদের কমিটির নামে। পরিচালকরা আশা করেছিলেন, একজন জাস্টিসের নাম জড়িত থাকায় পুলিশ নিশ্চয় তাঁদের ঘাটাবে না। পরের দুদিন অনুষ্ঠান হয় প্রেস ক্লাবের নামে। তার পেছনেও ছিলো একই আশা। হয়তো প্রেসকে সরকার চটাবে না। শেষের আট দিন অনুষ্ঠান হয় বেগম সুফিয়া কামাল পরিচালিত কমিটির।

এই এগারো দিনের অনুষ্ঠানে মোট আড়াইশ রবীন্দ্রসঙ্গীত

গীত হয় এবং চারটি নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করা হয়। নৃত্য পরিচালনা করেন ভক্তিময় দাস; গান ওয়াহিদুল হক এবং বক্তৃতা ইত্যাদি আতিকুল ইসলাম। প্রায় একশ শিল্পী এতে অংশ গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের মাস খানেক পরে একদিন শিল্পীরা জয়দেবপুরে একটি বনভোজনে মিলিত হন। সেখানে তাঁরা স্থির করেন যে, তাঁদের উদ্যমকে তাঁরা মরে যেতে দেবেন না বরং একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সংগঠনে তারা দেশজ সংস্কৃতিকে পুন প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং সে সংস্কৃতিচর্চায় উৎসাহ দেবেন। তাঁরা শুধু সঙ্গীতনৃত্যের চর্চায় লিপ্ত থাকতে চাননি—সামগ্রিকভাবে বাঙালি সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও পরিচর্যাই ছিলো তাদের লক্ষ্য। এমনি করেই 'ছায়ানটে'র জন্ম হয়েছিলো। পরের বছর পয়লা বৈশাখ তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে একটি সঙ্গীতবিদ্যালয় চালু করেন।

ছায়ানটগোষ্ঠীর কর্ণধার হলেন ওয়াহিদুলদম্পতি ওয়াহিদুল হক ও সনজীদা খাতুন। এঁরা যেহেতু উভয়েই সঙ্গীতশিল্পী, হয় তো সেকারণে ছায়ানটে সঙ্গীতই প্রাধান্য লাভ করেছিলো। ঢাকায় রবীন্দ্রসঙ্গীতকে প্রচার ও জনপ্রিয় করেন, বলতে গেলে, ছায়ানটই। বস্তুত পক্ষে, এঁরা একই সঙ্গে শিল্পী ও শ্রোতাদের শিক্ষিত করে তোলেন। এমন কি, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের সঙ্গীত সমালোচনা যাতে উন্নত মানের হয়, তার জন্যেও ছায়ানট সপ্তাহে একদিন ক্লাসের ব্যবস্থা করেন। শ্রোতাদের আসর নামে এরা বর্ষবরণ, বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব ও বসন্তোৎসব এই চারিটি অনুষ্ঠান করতেন। মঞ্চপরিকল্পনা, শিল্পী ও শ্রোতাদের আসনের বিশেষ ব্যবস্থা, সঙ্গীত-পরিবেশন পদ্ধতি সব কিছু মিলে এদের অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা ছিলো অভিনব ও অনুকরণীয়। খোলা মাঠের নীচে, কোনো ঝিলের তীরে বসে এক শারদপ্রাতে যখন ছায়ানটের সঙ্গে রাত পোহাতো, তখন তা জীবনের স্মরণীয় ঘটনা হয়ে উঠতো। কিন্তু এদের সহজ সুন্দর বাঙালি অনুষ্ঠান দেখে আর পরিবেশিত

মুড়কি খেয়ে ধর্মান্ধ সাংবাদিক নির্ভেজাল হিন্দুয়ানি বলে উচ্চকণ্ঠে তাকে ধিক্কার না দিয়ে পারেননি।

শতবার্ষিকীর সময়েই এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি প্রচার করেন। সেই থেকে বারংবার ছায়ানট এ গানটি পরিবেশন করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত এ গান বাংলা দেশের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যেহেতু বঙ্গ-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং যেহেতু তিনি ছিলেন সরকারি রোষের ফোকাল পয়েন্ট, সে কারণে ছায়ানট স্বভাবতই তাঁকে নিয়ে বিপুল উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন। ১৯৬৫ সালের বাইশে শ্রাবণ এরা শিলাইদহে গিয়ে সারারাত ধরে অনুষ্ঠান করেছেন। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী শাহাবুদ্দিন যখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরুদ্ধে জাতীয় পরিষদে একটি বিবৃতি দান করেন এবং তাঁকে সমর্থন জানান বিভিন্ন স্তরের কিছু সরকারি দালালে, তখন বাইশে শ্রাবণ উপলক্ষে ছায়ানট বুলবুল ললিতকলা অ্যাকাডেমির সহযোগিতায় ইনজিনিয়ার্স ইনস-টিটিউটে তিনদিন ব্যাপি এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এমন সাড়ম্বর অনুষ্ঠান জন্ম দিলেও সচরাচর পালিত হয় না।- বলা বাহুল্য এ হচ্ছে সরকারি জলুমের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচ্য সময়ে বেশি উৎসাহ দেখানো অবশ্যই প্রয়োজন ছিলো। তাই বলে ছায়ানট কেবল রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই সীমাবদ্ধ ছিলো না। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও অপ্রচালিত নজরুল-গীতিকে জনপ্রিয় করার দায়িত্বও তাঁরা সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের চেষ্টায় পূর্ব বাংলায় প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া ওস্তাদ আয়েত আলি খানের সুরবাহার বাদন ও নজরুলের অপ্রচলিত বারোটি গানের রেকর্ডও গৃহীত হয়।

সংস্কৃতিচর্চার প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে ছায়ানট তাঁদের শিল্পীদের দিয়ে আরো বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এমনি কয়েকটি

প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে 'ঐকতান', 'ক্রান্তি' ও 'আমরা কজনা'।

সঙ্গীতচর্চা ছাড়াও সমাজসেবার অনেকগুলি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে ছায়ানটের। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময়ে ছায়ানট দাঙ্গা শুরু হওয়ার পরের দিন আঠারোই জানুআরি একটি শান্তিমিসিল বের করেন। এবং তার পর কয়েক সপ্তাহ ধরে পুনর্বাসনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৬৫ সালে চট্টগ্রামের এবং ১৯৭০ সালে সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের সাইক্লোন ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের সময়ে ছায়ানট উল্লেখযোগ্য সেবাকার্য পরিচালনা করেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর থেকে শুরু করে তিন মাস পর্যন্ত ছায়ানটের কর্মীরা পটুয়াখালি অঞ্চলে চার হাজার গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য নানাবিধ পুনর্বাসনমূলক কাজ করেন।

ছায়ানটের কাযবারা বিশ্লেষণ করলে পূব বাংলার সাংস্কৃতিক বিবর্তনের স্বরূপ ও লক্ষ্য সম্পর্কে সম্যকভাবে বোঝা যাবে। বস্তুত, ছায়ানট কোনো বিচ্ছিন্ন প্রয়াস নয়, সে হচ্ছে সমগ্র পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক রূপান্তরের একটি অভ্রান্ত স্বাক্ষর। সরকারি হামলার মুখে পূব বাংলা যেমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ভালোবেসেছে, রবীন্দ্রনাথকে অর্জন করেছে, তেমনি অসাম্প্রদায়িক বাঙালি সংস্কৃতিকে অঙ্গীকার করেছে। ছায়ানট পূর্ব বাংলার সেই পরিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

যে সংস্কৃতির সেতু উভয় বঙ্গের মাঝখানের ব্যবধানকে নিকট করেছে, তা গড়েছেন অনেক মিলে। বরকত সালাম জব্বার যেমন আছেন এদের মধ্যে তেমনি আরো বহুজনের ভেতর আছেন ছায়ানটের শিল্পীরা -সনজীদা, ফাহমিদা, আফসারি, বিলকিস, ইফফাৎ আরা, রাখী, ফ্লোরা, কলিম শরাফী, ওয়াহিদুল হক, জাহেদুর রহিম, ইকবাল আহমদ।

'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' এবং 'মহাকবি স্মরণোৎসব'

ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার জনগণ যে বাঙালি জাতীয় চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বর্ধিত উৎসাহ তার একটি প্রধান অঙ্গ। প্রতি বছর একুশে ফেব্রুআরি উদ্‌যাপন উপলক্ষেই এই উৎসাহ পরিলক্ষিত হতো না, বরং আপনাদের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে একটা সামগ্রিক সচেতনতা ধীরে ধীরে বাঙালিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুত, সাধারণ মানুষের ভেতর গত দশকে সাহিত্য ও ভাষা বিষয়ে যে কৌতূহল ও আগ্রহ জন্মায় এবং সাহিত্যের যে অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ফুটে ওঠে পূর্ববর্তী কালে তার নজির নেই বললেই চলে। পাঁচ বছরের ব্যবধানে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' এবং 'মহাকবি স্মরণোৎসব' থেকে আমাদের মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে।

'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ। ১৯৬৩ সালের বাইশে সেপ্টেম্বর থেকে সাত দিন ধরে এই কর্মসূচীটি পালিত হয়। এই উপলক্ষে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে একটি প্রদর্শনী এবং প্রতিদিন একটি করে আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। এ সবের উদ্দেশ্য ছিলো বাংলা ভাষা ও লিপির উদ্ভব ও বিকাশ, বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন এবং বাংলা মুদ্রণের ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা। বহু চিত্র ও পোস্টারের দ্বারা এবং একটি পুস্তক প্রদর্শনীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে ভাষা, সাহিত্য

ও মুদ্রণের ক্রমবিকাশকে সহজবোধ্য করে তোলা হয়। এ ছাড়া প্রতিদিন একটি করে আলোচনা সভার ভেতর দিয়ে বাংলা ভাষা, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য, কাব্য, নাটক, গদ্য ও সঙ্গীতের বিবর্তনের ধারাটি সুস্পষ্ট করে ধরার চেষ্টা করেন উদ্‌যোক্তারা।

বাইশে সেপ্টেম্বর যে আলোচনাচক্রটি আয়োজিত হয় তার বিষয়বস্তু ছিলো বাংলা কাব্য। এ অনুষ্ঠানে চর্যাগীতি থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত যে কবিতার ধারাটি রচিত হয়েছে উদাহরণ সহযোগে সেটিকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ যাঁদের কবিতা পাঠ করা হয় তাদের মধ্যে, ধর্মীয় কারণে, যেমন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, নবীন সেন, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ কিংবা জীবনানন্দ বাদ পড়েনি তেমনি শাহ সগীর, বাহরাম খান, আলাওল, সৈয়দ হামজা, নজরুল, জসীম উদ্দীন কিংবা ফররুখ আহমদও বর্জিত হননি।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনের আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু ছিলো প্রাচীন বাংলা সাহিত্য এর পরিচয় দিতে গিয়ে একটি প্রবন্ধ পড়েন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং আলোচনা করেন সৈয়দ মুরতজা আলি।

দ্বিতীয় দিনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা শ্রোতাদের কাছে কত আকর্ষণীয় হয়েছিলো সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে; কিন্তু তৃতীয় দিনে 'গদ্য পাঠের' অভিনব আসরটি অত্যন্ত আনন্দ ও শিক্ষার বিষয় হয়েছিলো সাধারণ মানুষের কাছে। উইলিয়াম কেরী, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, বেগম রোকেয়া প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুলের গদ্য রচনা পাঠের সঙ্গে একটি বিবরণী পাঠ করে বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ধারাটি সহজবোধ্য করে তোলা হয়।

চতুর্থ দিনের জন্যে নির্ধারিত ছিলো মধ্য যুগীয় বাংলা সাহিত্য। এ আসরে পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এনামুল হক।

পঞ্চম দিনে বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে কয়েকটি বিখ্যাত নাটকের অংশ বিশেষের সুন্দর পাঠাভিনয়ের জন্যে। মুনীর চৌধুরীর একটি বিবরণী পাঠের সঙ্গে মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী', দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী', মীর মশারফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ', গিরিশ ঘোষের 'প্রফুল্ল', দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান', রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', শাহাদাৎ হোসেনের 'মসনদের মোহ' এবং নজরুলের 'ঝিলিমিলি' নাটকের অংশ বিশেষ পাঠ করে শোনানো হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ দিনটি বোধহয় সবচেয়ে বেশি শ্রোতাকে আকর্ষণ করে। সে দিনটি নির্ধারিত ছিলো বাংলা গানের জন্যে। 'হাজার বছরের বাংলা গান' নামক এ অনুষ্ঠানে, চর্যাপদ থেকে নজরুলগীতি পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলি গানের মাধ্যমে বাংলা গানের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি ধারণার সৃষ্টি করা হয়।

'মহাকবি স্মরণোৎসব' অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান 'রাইটার্‌স্ গিলড।' এ অনুষ্ঠানটি হয় 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের' ঠিক পাঁচ বছর পরে ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে। তার এক বছর আগে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আইয়ুবের মন্ত্রী শাহাবুদ্দিন এবং কবিসাহিত্যিক শিক্ষক ও শিল্পী নামধারী একদল দালাল প্রভৃত বিষোদ্‌গার করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য 'মহাকবি স্মরণোৎসব' একটি তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানের প্রথম দিনটি নির্ধারিত ছিলো রবীন্দ্রনাথের জন্যে। সেদিন রবীন্দ্রনাথের ওপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন আনিসুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন আবুল হাশেম, ইসলামিক অ্যাকাডেমির পরিচালক। আবুল হাশেম বলেন, পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথে যোগ অবিচ্ছিন্ন। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন

করেন ঢাকার প্রায় সকল প্রখ্যাত শিল্পী।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ দিন নির্ধারিত ছিলো গালিব ও ইকবালের জন্যে। ইকবাল চিরকালই সরকারের সমর্থনপুষ্ট। কিন্তু গালিবের নির্বাচন নিশ্চয় কর্মকর্তাদের উদার ও বলিষ্ঠ নীতির প্রমাণ দেয়।

তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানে স্মরণ করা হয় কাজী নজরুল ইসলামকে। এ উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা ও একটি গানের আসর অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ দিনে আলোচনার বিষয় ছিলেন মাইকেল। আলোচনার পরে এ দিন মাইকেলের দুটি গান গীত ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটি অভিনীত হয়।

'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' এবং 'মহাকবি স্মরণোৎসব'- উভয় অনুষ্ঠানেই একটি অভ্রান্ত অসাম্প্রদায়িক চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। এই অনুষ্ঠানদ্বয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে বিপুল দর্শক ও শ্রোতার সমাগম ঘটে। এতো দর্শক-শ্রোতা কোনো দেশের সাহিত্য সভায় উপস্থিত হলে তাকে বিরল ঘটনা বলে মনে করতে হবে। আসলে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলার প্রতি মানুষের যে চিত্ত জাগরণ ও অসীম ভালোবাসার জন্ম হয় তারই প্রেরণায় এই অসাধারণ উৎসাহ, এমন কি অরসিক অসাহিত্যিক সাধারণ মানুষের মনেও, সঞ্চারিত হয়েছিলো। আর ভাষা ও সাহিত্যের প্রশস্ত অঙ্গনে সমবেত হয়ে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা বিস্মৃত হতে পেরেছেন উদ্‌যোক্তা ও আহুত সকলেই।